সম্পদের জিহাদ

পিডিএফ-
মুহাম্মাদ হাবিব আল-হাসান

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

সম্পদের জিহাদ
মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর :
রিদুয়ানুল হক

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রকাশকাল :
১০ জানুয়ারি ২০১৭, ১১ রবিউস্ সানি ১৪৩৮, ২৭ পৌষ ১৪২৩ সাল ।

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৮৪২-১৬০১১১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com
FB Page : Sanjary Publication – সনজরী পাবলিকেশন

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ১৬০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র ।

Sompoder Jihad, By: Shaikhul Islam Dr. Mohammad Taherul Qadri, Translate By: Ridwanul Hoque, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 160/- $ USA 05.00

مَــوْلَايَ صَــلِّ وَسَــلِّمْ دَائِــمًا أَبَــدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَــيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَـوْنَيْـنِ وَالثَّقَـلَيْنِ
وَالْفَـرِيْقَيْـنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. (الصف: ١١)

–তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন–সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সূরা সাফ্‌ফ : ১১]

সম্পদ নফসের প্রিয়তম ও প্রেমাস্পদ বস্তু। এ সম্পদ অর্জন করার জন্য ব্যক্তি নিজেকে ব্যয় করে, ঝুকি নেয়, কখনো মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পদই তার প্রিয়তম ও প্রেমাস্পদ বস্তু। তাই আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় মুজাহিদদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদে তাদের প্রিয়মত ও প্রেমাস্পদ বস্তু ব্যয় করে। কারণ তাদের নিকট আল্লাহর নৈকট্য এবং তার প্রিয় হওয়াই সবচেয়ে বেশী পছন্দ, তাদের জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু এ জগতে আর নেই। যখন তারা আল্লাহর মহব্বতে তাদের প্রিয় বস্তু খরচ করল, তাদেরকে এর চেয়ে উন্নত পরবর্তী স্তরে উন্নীত করল, অর্থাৎ তার জন্যে তাদের নফস ত্যাগ করা, এটাই মুহব্বতের সর্বশেষ স্তর। কারণ মানুষের নিকট তার নফসের চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু আর নেই। যখন সে কোন জিনিস পছন্দ করে, তার জন্য সে নিজের প্রিয় বস্তু সম্পদ ও নফস খরচ করে। যখন নফস ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়, সে তার প্রিয় বস্তুকে প্রধান্য দিয়ে নফস পর্যন্ত ত্যাগ করে। সাধারণত এমনই ঘটে, এটাই মানুষ ও প্রাণীর স্বভাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আয়াতে নফসের আগে মালের কথা উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু নফস ত্যাগ করা সর্বশেষ স্তর, কারণ বান্দা প্রথমে সম্পদ খরচ করে জান রক্ষা করে, যখন সম্পদ শেষ হয়ে যায় তখন নিজের নফসই ত্যাগ করে। তাই জিহাদের ক্ষেত্রে নফসের আগে সম্পদের উল্লেখ করা বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি।

সম্পদের জিহাদ (جِهَادٌ بِالْمَالِ) নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরি পাবলিকেশন

ycwWGd-gnyexy' nvme Ayj-nvwmg

সূচীপত্র

☐ সম্পদঃ জিহাদের একটি উপকরণ/ ০১
- ◆ প্রাক্-কথন/ ০২
- ◆ জিহাদের তাৎপর্য/ ০২
- ◆ জিহাদ সংক্রান্ত এক ভ্রান্তির নিরসন/ ০৫
- ◆ ইবাদত ও নিয়তের পারস্পরিক সম্বন্ধ/ ০৬
- ◆ ইবাদত এবং প্রাপ্য-আদায়/ ০৮
- ◆ আলোচনার সারমর্ম/ ০৯
- ◆ জিহাদের প্রচলিত প্রকারসমূহ/ ১০
  - (১) جِهَادٌ بِالْمَالِ- সম্পদের জিহাদ/ ১০
  - (২) جِهَادٌ بِالنَّفْسِ- আত্মার জিহাদ/ ১০
  - (৩) جِهَادٌ بِالْقِتَالِ- জ্ঞানের জিহাদ/ ১০
  - (৪) جهاد بالقتال- অস্ত্রের জিহাদ/ ১০
- ◆ পারিভাষিক ও কর্মবিশ্বাসী মু'মিনের মাঝে পার্থক্য/ ১১
- ◆ মুসলমানিত্বের দাবির সাথে সাথে কষ্টসহিষ্ণুতার বিষয়টাও অপরিহার্য/ ১২
- ◆ কা'বার তুলনায় অন্তরের পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ/ ১৩
- ◆ শেষকথা/ ১৪

☐ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/ ১৫
- ◆ জিহাদের ক্ষেত্রে إِجَابَةٌ (গ্রহণ; কবুল; আহ্বান) ও إِنَابَةٌ (প্রত্যাবর্তন) এর মাঝে পার্থক্য/ ১৬
- ◆ জীবনের শিষ্টাচার ও মার্জিত ভাব/ ১৭
- ◆ অন্যান্য সাহাবি ও হযরত ওমর ফারুক-এর ঈমানের মাঝে পার্থক্য/ ১৮
- ◆ আল্লাহর কাছে অন্যায়ের কোনো স্থান নেই/ ১৮
- ◆ আদল ও অনুগ্রহ/ ১৯
- ◆ করুণা ও অনুগ্রহের উপর পরশ্রীকাতরতা মূর্খতার সমান/ ২০
- ◆ জিহাদের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত/ ২০
- ◆ জিহাদকারীগণের তুলনায় বিমুখতাপোষণকারীদের স্তরবিন্যাস/ ২১
- ◆ قَاعِدٌ ও قَائِدٌ এর মাঝে পার্থক্য/ ২২
- ◆ জিহাদ শুধু তীর-তরবারি-ধনুকের নাম নয়/ ২২
- ◆ সাহাবিদের উৎসর্গের এক ঈমান-বর্ধক ঘটনা/ ২৪
- ◆ অপরের কর্মকাণ্ড ছেড়ে নিজের কাজে মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়/ ২৪

- কুরআনে جهاد بالمال তথা সম্পদের জিহাদের প্রাধান্য ও পূর্বিতা/ ২৫
- তাকওয়া ও সম্পদের জিহাদ/ ২৫
- সম্পদের জিহাদের অগ্রবর্তিতার কারণ/ ২৭
- জীবন দিয়ে জিহাদ করার পূর্বে সম্পদের বিনিময়ে জিহাদ করার অবস্থান/ ২৭

☐ তৃতীয় পরিচ্ছেদ/ ২৯

- জিহাদে কল্যাণ ও অকল্যাণ সুপ্ত থাকে/ ২৯
- সহযোগিতা ও অসহযোগিতার স্পষ্ট মাপকাঠি/ ৩০
- কুরআনের আলোকে কল্যাণ ও তাকওয়ার স্বরূপ/ ৩১
- এক সাহাবির কুরআন-ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি/ ৩৩
- সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার/ ৩৪
- সম্পদের জিহাদ এবং আমাদের বিরূপ অবস্থা/ ৩৭
- দুটো অপরিহার্য বিষয়/ ৩৮
- দানবীর আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি/ ৩৯

☐ চতুর্থ অধ্যায়/ ৪০

(১) বাহ্যিক প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْفِعْلِ)/ ৪১

(২) অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْقُوَّةِ)/ ৪১

- এই দু প্রকারের মানবপ্রকৃতির দাবি/ ৪১
- পার্থিব মোহ ও আল্লাহপ্রেমের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা/ ৪২
- আল্লাহর পথে ব্যয় করার অনুঘটক/ ৪২
- কুরআনের দর্শন "بِرٌّ"-এর বিস্তারিত তাৎপয/ ৪৩
- একটি প্রচলিত ভুলের সংশোধন/ ৪৪
- মুত্তাকির কুরআনি সনদ/ ৪৬
- সম্পদের পবিত্রতা ও অপবিত্রতার একটি দৃষ্টান্ত/ ৪৬
- উল্লিখিত আয়াতের শানে নুজুল/ ৪৭
- সিদ্দিকি উৎসর্জনের ঈমানদীপ্ত ঘটনা/ ৪৮
- উত্তরসূরিদের উদ্দেশ্যে রাসূল-এর সুসংবাদ/ ৫০
- জুবাইদার মহল/ ৫১
- সম্পদের জিহাদই প্রকৃত তাকওয়া/ ৫২

☐ পঞ্চম অধ্যায়/ ৫৪

- মুসলমানিত্বের তিনটি অবিচ্ছেদ্য শর্ত/ ৫৪
- সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় সম্পদ-ব্যয়/ ৫৫
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক সাহাবির ঘটনা/ ৫৮
- ফরজ ছেড়ে নফলের পিছু ছোটা বোকামি/ ৬০
- এক আল্লাহপ্রেমী দরবেশের ঘটনা/ ৬১
- হাত কাজে ব্যস্ত, অন্তর বন্ধুর স্মরণে মগ্ন/ ৬১
- কুরআন মাজিদের মর্ম ও মানুষের ভুল ধারণা/ ৬২

☐ ষষ্ঠ অধ্যায়/ ৬৫

- সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সীমা/ ৬৫
- দুটি পৃথক কর্মপদ্ধতি ও বিধান/ ৬৬
- একটা নতুন জীবন-পদ্ধতি ও চিন্তার কুরআনি শিক্ষা/ ৬৭
- সম্পদ এক দিকে নেয়ামত, অপর দিকে পরীক্ষার বস্তু/ ৬৯
- আর্থিক অবক্ষয়ে ধর্মানুভূতি দৃঢ় হতে পারে না/ ৬৯
- দারিদ্র্য কুফরির অনুঘটক/ ৭০
- সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি/ ৭১
- সৈয়দ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বাণী/ ৭৩
- হাদিস দ্বারা উদ্ধৃত উক্তির সত্যায়ন/ ৭৩
- কুরআন মাজিদের আরেকটা বাণী/ ৭৪
- ভালো-খারাপ উভয় পথের নির্দেশনা/ ৭৫
- আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি মনোযোগী থাকেন/ ৭৬
- এক বিস্ময় সৃষ্টিকারী হাদিস/ ৭৭
- কুরআন মাজিদের সিদ্ধান্ত/ ৭৭

☐ সপ্তম অধ্যায়/ ৮০

- হিজরতের রাতে নিজ বাহনের ব্যবস্থাকরণ/ ৮০
- মসজিদে নববির নির্মাণে ভূমিনির্বাচন/ ৮১
- রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর করুণা না হলে... / ৮২
- আসুন! উম্মতের উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করি/ ৮২
- উৎসর্জনের মাপকাঠি/ ৮৩
- উক্ত হাদিস হতে উদ্ভূত নীতি/ ৮৫
- অভাব ও প্রাচুর্যের পার্থক্য/ ৮৬
- হাদিসের فَلْيَعُدْ بِهِ-এর তাৎপর্য/ ৮৭
- হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের শিক্ষণীয় ঘটনা/ ৮৯
- শেষকথা/ ৮৯

সম্পদ ঃ
জিহাদের একটি উপকরণ

প্রাক্-কথন

বর্তমান সময়ের দুর্ভাগ্য যে, গোটা বিশ্ব রাজনৈতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের পাশাপাশি সর্বত্র শিক্ষা, চিন্তা, কর্ম ও রুচির বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছে। এ অবর্ণনীয় বিকৃতি ও অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দুটো কারণ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা এবং দ্বিতীয়তঃ জিহাদের বাস্তব প্রয়োগে চরম উদাসীনতা।

বর্তমানে আফগানিস্তানের পর জবরদখলকৃত কাশমিরে জিহাদের আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে। কাশমিরে উচ্ছ্বসিত জিহাদের স্পৃহা দমনে ভারতের আজ পর্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও এরূপ হুমকি অনবরত আসতে রয়েছে। চরমপন্থী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলো এবং অগুনিত মুসলমানকে আগুনে পুড়িয়ে রক্তাক্ত করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গোটা মুসলিম উম্মাহর উচিত- দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পারস্পরিক বিরোধ ভুলে গিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া। এ মর্মে আল্লাহর পথে সম্পদ-ব্যয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ সফল করার কোনো বিকল্প নেই।

উম্মতের পথপ্রদর্শক ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী এই বিষয়ের উপর যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, এখানে সেসবের সংকলন করে পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মিনাহাজুল কুরআনের কাছে আবেদন, তারা যেন বর্তমান ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে সামনে রেখে মানুষের হাতে হাতে এই পুস্তক বিলিয়ে দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদের আবশ্যকতা এমন এক অপরিহার্য বিষয়, সাম্প্রতিক সময়ে যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুরুত্ব ও বাস্তবতার কারণে কোনো চিন্তাবিদ কোনোভাবেই বিমুখ থাকতে পারেন না; এবং এটা এ কারণে যে, বর্তমানে এটার উপর ইসলামি বিশ্বের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

জিহাদের তাৎপর্য

'জিহাদ' শব্দটি আরবি শব্দ 'জাহাদ' (جَهَدَ) হতে নির্গত। আরবি ভাষায় এর অর্থ- চেষ্টা করা; পরিশ্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হলো "শারীরিক, মানসিক, জীবন ও সম্পদ-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সামর্থ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করা। পরিস্থিতির প্রয়োজনে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শরীরের বিশ্রাম, স্বস্তি, আরাম ত্যাগ দেওয়া; মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাকে বিসর্জন দেওয়া; সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া, এমনকি প্রাণের মতো প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেওয়ার নামই হলো জিহাদ। মোট কথা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে সুউচ্চ ও মহান লক্ষ্যে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে-সব চেষ্টা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকেই জিহাদ বলা হয়।

জিহাদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কেউ কি এ কথা বলতে পারে যে, আমার পক্ষে জিহাদ সম্ভব না বা এটা আমার সক্ষমতার বাইরে? কারণ জিহাদ এমন এক কর্মপদ্ধতি, যা মানুষের গোটা জীবনকে বেষ্টন করে আছে।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ

–এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করতে হয়।[1]

আল্লাহর এই বাণীর মর্মার্থ এই যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এমন চেষ্টা, পরিশ্রম করতে হবে এবং কষ্ট ও দুরবস্থা সহ্য করতে হবে, যেন এতে হিজাদের মর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত আয়াতে জিহাদের বিশেষ কোনো প্রকারের উল্লেখ নেই; বরং সর্বতোভাবে জিহাদের নির্দেশ এসেছে। حَقَّ جِهَادِهِ অর্থাৎ জিহাদের মতো (প্রকৃত ও একনিষ্ঠ) জিহাদ করতে হবে। এই বাক্যাংশ দ্বারা সবকিছুকে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; সাথে সাথে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, জিহাদ পূর্ণরূপে হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে-সব শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন, জিহাদে তার পুরোপুরি প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ

–যে-সব মানুষ আমার পথে চেষ্টা করে, আমি তাদের অবশ্যই পথ দেখিয়ে থাকি।[2]

[1]. আল কুরআন : সূরা আল হাজ্ব, ২২:৭৮।

ncWGd-gnvdgy nwme Avj-nvmvg

উল্লিখিত আয়াতে এ-কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য সমস্ত পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাদের সব জটিলতাকে সহজ করে দেওয়া হয়; তাদের সব কষ্ট, দুরূহতা ও পরীক্ষা একসময় স্বস্তি ও শান্তিতে পরিণত করা হয়; জিহাদের পথে সমস্ত বাধাকে দৃঢ়চিত্তদের পথ হতে এভাবে দূরীভূত করা হয় যে, যেন মাঝপথে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

ইকবালের ভাষায়–

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

তার আঘাতে মরু-সাগর হয় কণা কণা
মিশে যায় পাহাড়- তার ভরে; হয় দানা।

উক্ত দর্শনকে কুরআন মাজিদে চূড়ান্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

–নিশ্চয় জটিলতার পর সহজতা, এবং সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততার পর্ব।[3]

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন, মাথায় কাফনের কাপড় পরে জিহাদের জন্য বেরিয়ে তো দেখো, তোমাদের সংকীর্ণতা সহজতার রূপ নেবে; বিপদের মেঘ মাথার উপর থেকে সরে যাবে। যতোই সামনে অগ্রসর হতে থাকবে, ততোই সহজ হতে থাকবে অভিযাত্রা, এবং গন্তব্য তোমাদের পদচুম্বন করবে। মূলত এই কষ্ট ও দুশ্চিন্তা অমৌলিক ও অপ্রাসঙ্গিক। মুজাহিদের জন্য এটা কোনো বাধাই নয়। মৃত্যু তার কাছে এমন এক দুয়ার, যা অতিক্রম করলেই সে অবিনশ্বর জীবনের সান্নিধ্য পায়। সংকীর্ণতা ও দুরবস্থায় সে তৃপ্তিবোধ করে। শারীরিক পরিশ্রম তার মাঝে বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা জাগাতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোনো বস্তুর প্রতি যখন মানুষ ভালোবাসা অনুভব করে, তখন সে তা অর্জনের পথে রাত-জাগার

[2]. আল কুরআন : সূরা আনকাবুদ, ২৯:৬৯।
[3]. আল কুরআন : সূরা আলাম্ নাশ্রাহ, ৯৪:৫-৬।

কষ্টকে বহন করে নিতে পারে অনায়াসে; এতে বরং সে তৃপ্তি পায়। এটা পার্থিব ও কৃত্রিম ভালোবাসার কথা। পার্থিব বস্তুকে পাওয়ার জন্য মানুষ আনন্দের নিদ্রাকে বিসর্জন দিতে পারে; এতে সে বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করে না। আবার যখন ভালোবাসার পাত্রের পরিবর্তন ঘটে, ভালোবাসা যখন প্রকৃত প্রেমিকের উদ্দেশ্যে হয়, তখন রাত্রিজাগরণ তার জন্য কোনো ব্যাপারই না। একারণেই রাত্রিজাগরণ আল্লাহওয়ালাদের নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী ও হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার অজু নিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন।

জিহাদ সংক্রান্ত এক ভ্রান্তির নিরসন

জিহাদের কথা শুনলেই প্রথমে যুদ্ধের কল্পনা আসে। অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ ও অস্ত্রচালনাকেই শুধু জিহাদ বলা হয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, শুধু যুদ্ধের মাঝেই জিহাদকে সীমাবদ্ধ রাখা ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামে জিহাদের ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ। এটা এতোটাই বিস্তৃত ও প্রশস্ত যে, যেমন ইবাদতের কথা বলা যেতে পারে। দৈনন্দিন ইবাদতের কথা শুনলে নামায, রোজা, যাকাত এবং সে-সব মাযহাবী কর্মকাণ্ড যা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত উপায়ে আদায় করা হয়– এসব বিষয়ের কথা মনে পড়ে। সাধারণ মানুষের ধারণায় ইবাদত বলতে সীমিত কোনো কাজকে বোঝায় না; বরং জীবনের এমন কোনো দিক বা মুহূর্ত নেই, যা ইবাদতের বাইরে।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

–আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।[৪]

উক্ত আয়াত এটাই নির্দেশ করে যে, ইবাদত মানুষের গোটা জীবনকে বেষ্টন করে আছে। জীবনের পরিধি ও আয়ত্ব যতোটুকু বিস্তৃত, ইবাদতের ধারণাও ততোটুকু বিস্তৃত। পুরো জীবনে বান্দা ও ইবাদত একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের যেকোনো কাজ হয়তো নামায, রোজা, হজ্জ

[৪]. আল কুরআন : সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬।

প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত হবে, অথবা অফিসিয়্যাল বা প্রশাসনিক হবে, অবসরের স্বস্তি কিংবা যুদ্ধসংকটের কোনো ব্যস্ততা হবে, সর্বাবস্থায় যদি বিশ্বস্ততার সাথে ও আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে করতে পারি, তাহলে নিঃসন্দেহে তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। অনুরূপ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসা বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থেকে হালাল রিযুকের অন্বেষণ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এতে এ-কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, ধর্মপদ্ধতি আল্লাহর কতো বড়ো নেয়ামত।

ইবাদত ও নিয়তের পারস্পরিক সম্বন্ধ

গোটা জীবনকে ইবাদতে পরিণত করার ধারণাটা হাদিসে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারী শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, জিহাদের প্রয়োজনে এটাকে ব্যবহার করবে। হাদিসে ওই ঘোড়ার মল-মুত্র, এমনকি তা পরিষ্কার করার কাজটাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। ইবাদতের এর চেয়ে প্রশস্ত ও স্পষ্ট ধারণা আর কী হতে পারে? উম্মতের উপর এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক বড়ো অনুগ্রহ যে, কেবল নিয়তের কারণেই কোনো কাজ ইবাদতে পরিণত হয়। অন্য দিকে নিয়তে ত্রুটি থাকলে নামায, রোজা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির মতো ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। তখন এটা লোকদেখানোর কাজে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে এসেছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

–এমন নামাজিদের জন্য আক্ষেপ! যারা নামাজে আলস্য প্রদর্শন করে, এবং কেবল লোকদেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে।[৫]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে যারা নামায পড়ে, তাদেরকে এখানে مصلين তথা নামাজি বলা হয়েছে। সাথে সাথে আলস্যপ্রদর্শন ও বিকৃতমানসের কারণে কঠিন শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। কী কারণে নামাজের মতো ইবাদতকে ধ্বংস ও দোজখের শাস্তির কারণ বলা হয়েছে?

[৫]. আল কুরআন : সূরা মাউন, ১০৭:৪-৬।

উত্তরে নিয়তের ত্রুটির কথাই বলতে হবে, যা নামাজের মতো উত্তম ইবাদতের আত্মা কেড়ে নিয়েছে এবং সাওয়াবের পরিবর্তে শাস্তির ঘোষণা এসেছে। এটা অবশ্যই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে যে, নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে ঘোড়ার অপবিত্রতা পরিচ্ছন্ন করার কাজ ইবাদতে পরিণত হয়, আবার নামাজের মতো ইবাদত নিয়তের কারণে ধ্বংস ও বিনাশের কারণে পরিণত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

–নিঃসন্দেহে কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৬]

জিহাদের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা ইবাদতের এই ধারণাকে স্পষ্ট করতে চাই যে, ইবাদত সম্পর্কিত খ্রিস্টধর্মের সীমাবদ্ধ ধারণায় আমরা প্রভাবিত হয়ে নিজেরাও ইবাদতকে মসজিদের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করতে শুরু করি। এই ধারণা আমরা পোষণ করতে শুরু করি যে, মসজিদের বহিঃস্থিত কর্মকাণ্ড, অফিস-কারখানা-দোকান প্রভৃতি জায়গার কাজকর্ম কিভাবে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অথচ কুরআন মাজিদে এভাবে এসেছে,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

–(তারা) এমন মানুষ, ব্যবসায় ও কেনাকাটা যাদের বিরত রাখতে পারে না আল্লাহ যিক্র হতে।[৭]

এই আয়াত হতে বোঝা যায় যে, আল্লাহর সাথে যাদের আনুগত্যের সম্পর্ক দৃঢ় হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যস্ততা কিছুতেই আল্লাহর স্মরণ হতে তাদের বিমুখ রাখতে পারে না। ইসলামে ইবাদতের পরিভাষা ও ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক, যা মসজিদের বাহির ও ভেতরের পুরো মানবজীবনে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এমনটা হতে পারে না যে, মানুষ যতক্ষণ মসজিদের ভেতরে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর সামনে নতমুখ থাকবে, আর বের হলে উদ্ধত আচরণ করবে। এ কারণেই কুরআনে বেদুইনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, "তোমরা নিজেদের মু'মিন বলো না, বরং বলো আমরা ইসলাম এনেছি।" অর্থাৎ এখনো

৬. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু বদউল ওহী, ১:৩, হাদিস : ১।
খ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী মা আন্নী বিহিত্ ত্বালাক ওয়ান্ নিয়্যাত, ৬:১১৮, হাদিস : ১৮৮২।
গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবুন্ নিয়্যাত, ১২:২৭৪, হাদিস : ৪২১৭।
৭. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:২৭।

আমাদের মাথা নত হয়েছে, হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করে নি। সম্প্রসারিত অর্থ এই যে, মানুষ তখনই মু'মিন হতে পারে, যখন মসজিদের পরিবেশ পারিবারিক ও বাইরের গোটা পরিবেশকে প্রভাবিত করবে; আল্লাহর প্রতি যে অনুরাগ নামাজের সময় থাকে, তা নামাজের বাইরেও থাকবে; এই ধারণা মর্মস্থিত হতে হবে যে, যেভাবে আল্লাহ সবখানে উপস্থিত থাকেন, সেভাবে সবখানে তার আনুগত্যও করা যাবে; মসজিদের ভেতরে যেভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়, অনুরূপভাবে মসসিদের বাইরেও তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। এটা ইসলামের ধারণা নয়; এটা হিন্দুধর্মের ধারণা যে, স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মন্দিরে যাওয়ার বিকল্প নেই। মুসলমানরা তাদের স্রষ্টাকে মসজিদে, অফিসে, ঘরে- সবখানে আহ্বান করতে পারে। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বতোবিদ্যমান।

ইবাদত এবং প্রাপ্য-আদায়

অধিকার বা প্রাপ্য তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে নিচের হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করা যায়।

এক সাহাবি সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তিনি বিয়ে করেন। কিছু দিন পর তার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, বলো তোমার কী অবস্থা? তোমার স্বামী তোমার সাথে কী আচরণ করেছে?

তিনি বলতে লাগলেন, "আমি খুব সৌভাগ্যবতী! স্বামী হিসেবে এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি দিনে রোজা রাখেন এবং রাত জেগে নামায পড়েন।" প্রশংসা শোনার পর আড়ালে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম অভিযোগ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে স্পষ্ট হতে বিলম্ব হলো না। তিনি তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলে লোকটা উত্তরে বলে, হ্যাঁ, দিনে রোজা রাখি এবং রাতে নফল নামায পড়ি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করো না? আরয করলো– নফল আদায় করতে গিয়ে আসলে সুযোগ পাই না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "রাত জেগে নফল পড়ার তুলনায় স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করাই উত্তম, এবং এটাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।"

এই হাদিসের মর্ম এটাই ইঙ্গিত করে যে, প্রাপককে তার প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া ফরযের সমপর্যায়ের, যা নফলের তুলনায় উচ্চপর্যায়ের। নফল কখনো ফরযের উপর প্রাধান্য পায় না। অনুরূপ কুরআন পড়া সুন্নাত, কিন্তু শোনা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟

–যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তোমরা নীরবে শ্রবণ করো।[৮]

সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে, কুরআন তিলাওয়াতকারী ইবাদতে মশগুল থাকে, শ্রবণকারীর তুলনায় তার সাওয়াব বেশি হয়। কিন্তু শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো, তিলাওয়াতের কাজ সুন্নাত, কিন্তু শ্রবণের কাজ ফরযের সমতুল্য। ধর্মের প্রত্যেকটি বিষয়ে সূক্ষ্ম দর্শন রয়েছে। কুরআন শ্রবণকে ফরযের পর্যায়ে উন্নীত করাও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুন্নাত। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সুন্নাত যতো উচ্চ, তার মর্যাদাও ততো উচ্চ।

আলোচনার সারমর্ম

উপরের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ-কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদতের ধারণায় ইসলাম আদর্শগত ও পার্থিব কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী পার্থক্যকে মুছে দিয়েছে এবং মানুষের পুরো জীবনকে ইবাদতের পরিধির আওতাভুক্ত করেছে। আনুগত্য মানুষের অনুভূতিতে এ ধারণাই বদ্ধমূল করে যে, বান্দার কাজই হচ্ছে প্রভুর আনুগত্য করা। যদি বান্দা উদ্ধত আচরণ করে, তবে তার নিজেকে বান্দা বলে দাবি করতে লজ্জিত হওয়া উচিত।

زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی
জীবন সে তো আরাধনায় ফুল্য
উপাসনাহীন জীবন লজ্জাতুল্য।

বান্দা যদি তার মালিকের আনুগত্য না করে, তবে তার ঘটনা হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর ওই দরবেশের মতো হবে, যিনি তাতারি আমিরের এক প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন। আমিরের প্রশ্ন ছিলো "তোমার দাড়ির পশম উত্তম নাকি আমার কুকুরের লেজ?" তিনি বলেছিলেন, আমি যদি আমার মালিককে সন্তুষ্ট

[৮]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭:২০৪।

রাখতে পারি, তবে আমার দাড়ির পশম উত্তম; আর যদি না পারি, তবে তোমার কুকুরের লেজ উত্তম।"

জিহাদের প্রচলিত প্রকারসমূহ

বিস্তৃতির কারণে জিহাদ যদিও মানবজীবনের সমস্ত পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত, তবু সাধারণত নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিভক্ত করা চলেঃ

(১) جِهَادُ بِالْمَالِ- সম্পদের জিহাদ।
(২) جِهَادُ بِالنَّفْسِ- আত্মার জিহাদ।
(৩) جِهَادُ بِالْعِلْمِ- জ্ঞানের জিহাদ।
(৪) جِهَادُ بِالْقِتَالِ- অস্ত্রের জিহাদ।

(১) جِهَادُ بِالْمَالِ- সম্পদের জিহাদ

নিজের সম্পদকে ধর্মের উৎকর্ষ-সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করাকে বলা হয় جِهَادُ بِالْمَالِ বা সম্পদের জিহাদ।

(২) جِهَادُ بِالنَّفْسِ- আত্মার জিহাদ

নিজের জীবনকে আল্লাহর জন্য বিপদ ও কষ্টের মুখোমুখী করা এবং শান্তি ও বিশ্রামকে উৎসর্গ করার নাম جِهَادُ بِالنَّفْسِ বা আত্মার জিহাদ।

(৩) جِهَادُ بِالْقِتَالِ- জ্ঞানের জিহাদ

জ্ঞানের জিহাদ হলো- কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া, যেন কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হিদায়তের আলোয় পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে।

(৪) جهاد بالقتال- অস্ত্রের জিহাদ

এটা অস্ত্রের জিহাদ, যুদ্ধের মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে। এতে জীবন পর্যন্ত উৎসর্জিত হয়। এই জিহাদের বিজয়ীকে 'গাজি' এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জনকারীকে 'শহিদ' বলা হয়।

ع — ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی
জীবনের নাম জীবন হরণ অথবা বিসর্জন

আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে إحْسَان তথা অনুগ্রহের সাথে তুল্য করেছেন। এর স্তর ও মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

–নিঃসন্দেহে তারাই ঈমানদার, যারা (জীবন ও আত্মার সাথে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর তাতে সংশয় পোষণ করে না; আল্লাহর পথে জিহাদ করে নিজের সম্পদ ও জীবনকে বিসর্জন দিয়ে। তারাই প্রকৃত সত্যবাদী (মুসলমান)।[১]

সন্দেহাতীতভাবে উক্ত আয়াতে ঈমানের শর্তের বর্ণনা এসেছে; ঈমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তীতে জিহাদের কথা বলা হয়েছে। এখানে এ কথা বোঝা যে, জীবন ও জিহাদ পরস্পর সম্পৃক্ত নয় এবং জিহাদ অপ্রাসঙ্গিক ও ঐচ্ছিক কাজ, তাহলে এটা হবে চরম বিভ্রান্তি। উল্লিখিত আয়াতের গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কুরআনের ভাষ্য মতে জিহাদ জীবনের জন্য অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি সত্য মু'মিন হতে পারে না।

পারিভাষিক ও কর্মবিশ্বাসী মু'মিনের মাঝে পার্থক্য

পরিভাষায় সে-সব ব্যক্তিকে মু'মিন বলা হয়, যারা অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকারোক্তি দেয়। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী কোনো মানুষ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার জীবনের প্রতিটি রন্ধ্র জিহাদের সাজে সজ্জিত হবে না। মু'মিনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুরআন মজিদে إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ-এর পরে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি শর্ত ক্রমানুযায়ী বিবৃত হয়েছে:

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(২) আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৩) বিশ্বাস স্থাপনের পর প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হলেও, এমনকি প্রাণ চলে গেলেও বিশ্বাসের উপর অটল থাকা।

[১]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯:১৫।

(৪) সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ করা। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আল্লাহর পথে নিজের সম্পদকে বিলিয়ে দেয়া।
(৫) আল্লাহর পথে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেওয়া। অত্যাচার-নিপীড়ন-কষ্ট সহ্য করা।

কুরআনের পরিভাষায় এসব হচ্ছে মু'মিনের গুণাবলি। যে ব্যক্তি এসব গুণাবলি ধারণ করে, কেবল সে-ই নিজেকে ঈমানদার দাবি করতে পারে। মোটকথা কুরআনের ভাষায়, তারাই মু'মিন, যারা ঈমানের উপরিউক্ত দাবিসমূহ জীবন ও প্রাণ দিয়ে পূরণ করে এবং অবিচলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

এতে বোঝা যায় যে, মু'মিন হবার জন্য এটা জরুরি যে, তার জীবনে পদে পদে বিপদ, জটিলতা ও পরীক্ষা ক্রমাগত আসতে থাকবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এসব অতিক্রম করে যেতে হবে তাকে। মুসলমানিত্ব সহজ কোনো কাজ নয়। বরং আল্লামা ইকবালের মতে,

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

এ তো প্রণয়-পথে সাক্ষ্যের চরণ রাখা;
মানুষ মুসলিম হওয়াকে সহজ ভাবে।

গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বাতিল ও কুফরের সাথে সংঘর্ষে জড়িত হবার নামই হলো ঈমান। এ ক্ষেত্রে লোভ-লালসা, ব্যক্তিস্বার্থকে তীক্ষ্ণভাবে পদদলিত করতে হয়; কপটতা ও পাপাচারের সমুদয় মূর্তিতে পিষ্ট করতে হয়, যা ঈমানকে গরলরূপে বিদ্ধস্ত করে। যখন মানুষ ঈমানের উপত্যকায় পদার্পণ করে, তখনই পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে হক-বাতিল এবং ভালো-মন্দের মাঝে পরিচিতি নিরূপণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যদি এই পরিচিতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তবে জীবনে ধেয়ে আসে রকমারি কপটতা। তখনই লেনদেনের ক্ষেত্রে এই মিথ্যাকে সুযোগ-সুবিধা-কৌশল প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। অনুরূপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই মিথ্যাপরম্পরাকে 'রাজনৈতিক কৌশল' (Political Strategy) প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়।

মুসলমানিত্বের দাবির সাথে সাথে কষ্টসহিষ্ণুতার বিষয়টাও অপরিহার্য

বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলতে গেলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাহিনী মনে

রাখতে হয়। أَحَدٌ أَحَدٌ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) শব্দ বলার পরিবর্তে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে উত্তপ্ত পাথরের বুকে নিজের দেহকে অনবরত দগ্ধ করার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় এবং প্রফুল্লচিত্তে তা বরণ করে নিতে হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে কা'বা ঘরে পাথর দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। একটুখানি জ্ঞান ফিরে পেলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা জিজ্ঞেস করছেন। বোঝা যাচ্ছে, ঈমান প্রকৃত হতে হলে তা উত্তপ্ত বালিতে দগ্ধ হওয়া এবং প্রস্তর নিক্ষেপিত হবার পরও অনড় থাকতে হবে। এমনটা নয় যে, সুসময়ে ঈমান বাড়তে থাকবে এবং দুঃসময়ে তা বিচলিত হবে। তখন সেটা ঈমান থাকবে না; ওটা স্বার্থপরতা।

ঈমানে অবিচলতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ

–নিঃসন্দেহে তারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের রব আল্লাহ; এবং তারা এতে অবিচল থেকেছে।[১০]

আয়াতের মর্ম হতে বোঝা যায় যে, সহজতা ও সুসময়ে তো যে কেউ আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে; দুঃসময়ে, যখন বিপদের আগমন একের পর এক ঘটতে থাকে, যখন দুরূহতার ভয়াবহতায় আত্মা বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহর স্মরণে অবিচল থাকার নামই হলো প্রকৃত ঈমান। আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা মান-মর্যাদা, প্রবৃত্তি, প্রসিদ্ধি, ধন-সম্পদের লোলুপতায় কখনো বিচলিত হন না। এসব পার্থিব সমৃদ্ধি তাদের দৃঢ়চিত্ততায় বিন্দুমাত্র কম্পন সৃষ্টি করতে পারে না।

কা'বার তুলনায় অন্তরের পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ

মানুষের অন্তর তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। এটা জীবনের মরুভূমিতে অবস্থিত কোনো শুকনো পাতার মতো, যা লোভ-প্রবৃত্তির মৃদু বাতাসও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মানুষকে প্রণোদনা দিতে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন এভাবে, এই অন্তরকে দৃঢ়তার সাথে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে তা আল্লাহর স্মরণে এতোটাই উন্মুখ হয়ে পড়বে যে, প্রবৃত্তির ঝড় তাকে কখনোই নাড়াতে পারবে না। যদি অন্তর প্রভুর নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট হতে পারে, তবে সে কী পেয়েছে- না পেয়েছে সে হিসেব তার কাছে গৌণ। ধন-সম্পদের প্রবৃত্তি কখনো তার কাছে দৃশ্যমান হয় না। সর্বদা

[১০]. আল কুরআন : সূরা হা-মীম আস্ সিজদাহ, ৪১:৩০।

wcwWGd-gnvqv` nvwme Avj-nvwmg

সে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ ধরনের অন্তর হাজার কা'বা হতে উত্তম। কারণ কা'বা হলো ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক মাটি-পাথরের নির্মিত কোনো ঘর, আর আল্লাহর জিকরের কারণে মানুষের অন্তর ওই কা'বার প্রভুর অবস্থানস্থলে পরিণত হয়।

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

হৃদয়ে, করে প্রভুর স্মরণ বড়ো হজ্জ;
হাজার কা'বার চেয়ে একটি মন অনেক বড়ো।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কোনো সীমা-পরিধিতে আবদ্ধ করা যায় না। তবে কা'বাকে আল্লাহর ঘর বলা হয় শুধু এ জন্য যে, তা ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা কর্তৃক নির্ধারিত; অন্যথায় তিনি সময় স্থান দিক- সব বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র। তবে, যে অন্তর সবসময় আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে, তাকে তিনি নিজের অবতরণস্থলরূপে গ্রহণ করেন। নিচের যুক্তিসমূহ এটাই নির্দেশ করে।

لَيْسَ لِيْ مَكَانٌ سِوَى الْإِنْسَانِ

মানুষ ছাড়া আমার কোনো জায়গা নেই।

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ تَعَالٰى

মু'মিনের অন্তর আল্লাহর আর্‌শ।

সুতরাং যে অন্তরে আল্লাহ থাকেন তাতে প্রবৃত্তি, লোভ ইত্যাদি কিভাবে থাকতে পারে?

শেষকথা

জিহাদ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বান্দার প্রতি এটার নির্দেশ হলো– جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ নিজের সম্পদ ও জীবনকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কোনোরূপ কার্পণ্য করা যাবে না। কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই জীবন ও সম্পদের জিহাদ হতে হবে। যারা কেবল লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে, নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের লোভে ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা আল্লাহর কাছে এর কোনোই প্রতিদান পাবে না। ব্যক্তিগত সমস্ত প্রবৃত্তিকে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে বিসর্জন করার নামই হলো জিহাদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতঃপূর্বে আমরা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অংশে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো যে, বিভিন্ন প্রকারের জিহাদ যেমন, সম্পদের জিহাদ, আত্মার জিহাদ, জ্ঞানের জিহাদ বা যুদ্ধজিহাদ- যেরকম জিহাদই হোক না কেন, সব জিহাদে আল্লাহর তাওফিক বাঞ্ছনীয়। অন্য কথায় আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও তাওফিক ছাড়া জিহাদের সৌভাগ্য কারো হয় না।

این سعادت بزور بازو نیست
تانہ بخشد خدا ئے بخشندہ

এই সাফল্য বাহুবলের জোরে নয়;
এটা অনুগ্রহ- মহান আল্লাহর করুণায়।

আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কেউ এই ভাগ্য নিজ শক্তিতে ছিনিয়ে আনতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ

–আল্লাহর পথে জিহাদ করো, পরিপূর্ণ জিহাদ।[১১]

এই আয়াতে এভাবে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন জিহাদ পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যায়। জিহাদ কখন পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব? আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে যখন শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্ত যোগ্যতাকে পরিপূর্ণ সম্পদ ব্যয়ের ভিত্তিতে কাজে লাগানো হয়, এমনকি যখন জীবনটা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া হয়, কেবল তখনই জিহাদ পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব হয়।

جان دی' دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

প্রাণ দিলাম, তবে প্রাণ তো তারই দেওয়া;
তবু সত্য হলো- হয় নি আদায় অধিকার।

[১১]. আল কুরআন : সূরা আল হাজ্জ, ২২:৭৮।

জিহাদের ক্ষেত্রে إِجَابَةٌ (গ্রহণ; কবুল; আহ্বান) ও إِنَابَةٌ (প্রত্যাবর্তন) এর মাঝে পার্থক্য

পর্বের শুরুতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, জিহাদের তাওফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে হয়। যাকে তিনি নির্বাচন করেন, সে-ই ওই পথে চলতে পারে। আল্লাহর পথে এই নির্বাচন দুটো উপায়ে হয়ে থাকে। একদল এমন হয়ে থাকে, যাদের আল্লাহ তা'আলা নিজেই জিহাদের জন্য নির্বাচন করেন। জিহাদের সমস্ত জটিলতাকে তাদের জন্য সহজ করে দেন। গন্তব্যদূরত্ব তাদের জন্য সংকোচিত হয়ে আসে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তারা লক্ষ্যে উপনীত হয়। আরেক দল থাকে, যারা কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ দূরত্বের পর গন্তব্যের দ্বারস্থ হয়। পদে পদে কষ্ট, জটিলতা, বিপদ তাদের নিপীড়ন করে। তারা প্রতিনিয়ত দুরূহতা ও কঠিনতার মুখোমুখী হয়। এ জন্য তাদের অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। উভয় পক্ষের আলোচনা কুরআন মাজিদে এভাবে এসেছে:

ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

–আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করেন, এবং যে ব্যক্তি তার দিকে ফিরে আসে তাকে তিনি পথ দেখান।[১২]

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে প্রথম দলে ওসব ব্যক্তি থাকেন, যাদের তিনি মহান উদ্দেশ্যে নির্বাচন করেন এবং প্রকৃতিগতভাবে তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যের তাওফিক দান করেন। তারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হন; তারা বিশেষ তাওফিক, করুণা ও অনুগ্রহে সিক্ত থাকেন। আল্লাহ নিজেই নিজের করুণায় এসব বান্দাদের নির্বাচন করে থাকেন। অপর দিকে যেসব বান্দার কথা ويهدي إليه من ينيب বাক্যাংশে এসেছে, তারা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পর তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন। তাদের উদ্দেশ্যেই নিচের ইরশাদ হয়েছে:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

–যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি।[১৩]

[১২]. আল কুরআন : সূরা শুরা, ৪২:১৩।

এভাবে তাদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর তারা লক্ষ্যে পৌছান। এটা মনে রাখা দরকার যে, পরবর্তীতে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহ বিলুপ্ত হলে তারা আর গন্তব্যে পৌছাতে পারেন না।

জীবনের শিষ্টাচার ও মার্জিত ভাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

–যা কিছু নেয়ামত তোমাদের কাছে রয়েছে, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।[১৪]

অর্থাৎ হে রাসূল, তুমি বান্দাদের এই শিক্ষা পৌছিয়ে দাও যে, তারা যে-সব নেয়ামত লাভ করে, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাদের এই অনুভূতি ও আনুগত্যবোধ থাকা উচিত যে, সমস্ত অনুগ্রহ ও করুণার কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি চাইলে যে কাউকে অঢেল করুণা করতে পারেন, আবার না চাইলে বঞ্চিতও করতে পারেন। এতে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, কেউ নিজের ক্ষমতার বলে করুণা পেতে পারে না যদি আল্লাহ সহায় না হন। পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় নেয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে, এবং যে তার কাছে কামনা করে তাকে দিয়ে থাকেন। স্বয়ং আল্লাহ যাদের নির্বাচন করেন, তাদের ভাগ্য কতো ভালো! গন্তব্য তাদের পদচুম্বন করে। তারা এক পা উঠালে তাদেরকে সত্তর পা এগিয়ে দেওয়া হয়। এ জন্য গন্তব্যে পৌছাতে তাদের বেশি কষ্ট করতে হয় না। আর দ্বিতীয় দল যারা إنابة - তথা যারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, তারা কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে গন্তব্যের দ্বারস্থ হন। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম পক্ষ طالب، مريد তথা প্রত্যাশী ও অনুগামী, এবং দ্বিতীয় পক্ষ مطلوب، مراد তথা প্রত্যাশিত ও উদ্দিষ্ট।

[১৩]. আল কুরআন : সূরা আনকাবুদ, ২৯:৬৯।
[১৪]. আল কুরআন : সূরা নমল, ১৬:৫৩।

অন্যান্য সাহাবি ও হযরত ওমর ফারুক-এর ঈমানের মাঝে পার্থক্য

অধিকাংশ সাহাবা কেরাম এমন পবিত্র আত্মার অধিকারী, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত্যাশ্চর্য সত্যতা, আমানত, ধার্মিকতা, বিস্ময়কর অভ্যাস ও আচরণ দেখে অভিভূত হয়ে ঈমান গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য তাদের অন্তরাত্মায় এক বৈপ্লবি পরিবর্তন সাধন করে। কিন্তু ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক অনবদ্য ও অনন্য ব্যক্তিত্ব, যার ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্যের পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন, اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (হে আল্লাহ! আপনি ওমরের দ্বারা ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি করুন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ হতে এই দোয়া নির্গত হতে বিলম্ব হলো না, তার অন্তরে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, অবশেষে ইসলামের পক্ষে খাপমুক্ত তরবারির বেশে ফিরে আসেন। ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতিহাসের সব পুস্তকে বিস্তারিত রয়েছে। যিনি নিজের ভগ্নিপতিকে প্রচণ্ড ক্রোধে প্রহার করছিলেন, তিনিই তার মুখনিঃসৃত বাণীতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

এটা নিঃসন্দেহে إجابة (ইজাবাহ) এর প্রভাব, যা মানুষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করে। এ কারণেই হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানবেতিহাসে এক মহান ব্যক্তিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে অমর হয়ে আছেন।

আল্লাহর কাছে অন্যায়ের কোনো স্থান নেই

এখানে প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই إجابة ও إنابة তথা বান্দাকে নিজ ইচ্ছায় নির্বাচিত করা এবং আরেক প্রকার বান্দাকে প্রচেষ্টার মুখোমুখী করার দ্বারা বান্দাকে দুভাগে বিভক্ত করা হলো না? এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যায় হয়ে গেলো না?

উত্তরঃ না। এটা কখনো অন্যায় নয়। আল্লাহর ব্যাপারে এরূপ ধারণাও অসঙ্গত। কারণ যতোটা ন্যায়ের সম্বন্ধ- তাতে কারো সাথে বিন্দুমাত্র পার্থক্য করার সুযোগ থাকে না। আল্লাহর কাছে অন্যায়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ

যদি ভালো বা মন্দ হয়, তার প্রতিদানও অনুরূপ ভালো বা মন্দ হওয়া- এটাই ন্যায়। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে তাদের ন্যায্য ফলাফল দেওয়াই ন্যায় বা আদল। যিনি নিজেকে বিচার দিনের মালিক বলে দাবি করেন, তিনিই সেদিন প্রত্যেককে তাদের প্রতিদান দেবেন। কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে মানুষের আদালতে ন্যায় হতে বঞ্চিত হতে পারেন; তবে যিনি বিচার দিনের মালিক, তার কাছে কখনো বঞ্চিত হবে না। কারণ আদল বা ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার অধিকার; এতে তাদের পরস্পরের মাঝে সমতার বিধান সুরক্ষিত। এটা সেই অধিকার, যা কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া প্রত্যেক বান্দার জন্য নির্ধারিত।

আদল ও অনুগ্রহ

আদল হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বান্দার অধিকার। কেউ এই অধিকারবঞ্চিত হলে সে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে। হে মাওলা, আমি কেন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলাম? কিন্তু অনুগ্রহের বেলায় এ জাতীয় প্রশ্ন অসমীচীন। করুণা ও অনুগ্রহ স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিশেষ দান, যা তার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন–

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছে, দান করেন।[১৫]

আদল সবার জন্য সমান। মু'মিন-কাফির, আল্লাহর বন্ধু-শত্রু, সৎ-পাপিষ্ঠ সবার জন্য আদলের বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। এর জন্য 'মাইইয়াশা' مَنْ يَشَاءُ শব্দের প্রয়োগ হবে না। আদল প্রত্যেকের জন্য, তবে অনুগ্রহ কেবল কাঙ্ক্ষিতের জন্য। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্নও করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ

–তিনি যাকে ইচ্ছে, রহমতে বিশেষিত করেন।[১৬]

এখন কোনো বান্দা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে কারো কিছু বলার অবকাশ থাকে না। কারণ অনুগ্রহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এভাবে সৎকর্মকারীকে তার প্রতিদান এবং

১৫. আল কুরআন : সূরা জুমু'আহ, ৬২:৪।
১৬. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১০৫।

পাপিষ্ঠকে তার শাস্তিপ্রদান আদল ও ইনসাফের দাবি; কিন্তু কোনো পাপিষ্ঠের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন অনুগ্রহের আওতাভুক্ত। কেউ যদি এক পা অগ্রসর হয়, এবং এভাবে তার নিকটবর্তী হওয়া আদলের পর্যায়ে পড়ে; অপর দিকে কেউ এক পা অগ্রসর হলে আল্লাহ যদি তাকে সত্তর ধাপ এগিয়ে দেয়, তবে এটা হবে তার প্রতি অনুগ্রহ। এতে কারো অভিযোগের সুযোগ থাকে না। এটাই ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ এর অন্তর্নিহিত অর্থ।

করুণা ও অনুগ্রহের উপর পরশ্রীকাতরতা মূর্খতার সমান

বান্দার উপর আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে বান্দার শুভ নিয়ত ও কর্মনিষ্ঠতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বান্দাকে কাজে লাগাতে চান, তবে তাকে অনুরূপ যোগ্যতায় সজ্জিত করেন, যা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটাই তার বিশিষ্টতা ও ব্যতিক্রমী গুণ। অনুগ্রহসিক্ত এরূপ কোনো বান্দার উপর বিদ্বেষ পোষণ করা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ আল্লাহর আদল সবার জন্য সমান। উপরে বর্ণিত হয়েছে, অনুগ্রহ তার বিশেষ দান, যা তিনি যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন। এতে কারো দাবি করার অধিকার থাকে না যে, অমুকের উপর অনুগ্রহ কেন? আমার উপর নয় কেন? এরূপ দাবি অর্থহীন ও মূর্খতা। প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া তার আদল, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেওয়া তার অনুগ্রহ মাত্র। এতে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কোনো অভাবগ্রস্ত যদি তার অধিকারানুযায়ী না পেয়ে থাকে, তবে এটা হতে পারে আদলের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে অধিকার পুরোপুরি পাবার পর যদি অতিরিক্ত পেয়ে থাকে, তাহলে এটা হবে অনুগ্রহ ও করুণা। এ ক্ষেত্রে সবাই সমান নয়। এটা মালিকের ইচ্ছা ও তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

উপরের আলোচনা থেকে আদল (ন্যায়) ও অনুগ্রহের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেলো। এখন আমরা এ বিষয়টা পরিষ্কার করতে চাই যে, জিহাদ কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ হতে পারে।

জিহাদের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত

সব মু'মিনকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কোনো ঈমানদার এই নির্দেশের আওতামুক্ত নয়। 'جَاهِدُوا'র নির্দেশ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। জিহাদের প্রান্তর সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু

মানুষকে هُوَ اجْتَبٰكُمْ -এর আলোকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্বাচন করে থাকেন, আর তারা জিহাদের হক পুরোপুরি আদায় করেন। এমন কিছু মানুষও পাওয়া যায়, যারা নিজেদের প্রচেষ্টায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন; তাদের উদ্দেশ্যে নিচের ইরশাদ–

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

–আর তোমাদের জন্য ধর্মের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা রাখেন নি।[১৭]

জিহাদের পথে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতার কাজ করে না। জিহাদের সৌভাগ্য যেভাবেই হোক না কেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং বিশেষ নেয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদকারীগণের তুলনায় বিমুখতাপোষণকারীদের স্তরবিন্যাস

জিহাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে প্রস্তুত থাকা; আর যারা এতে আলস্য প্রদর্শন করে, তারা পিছিয়ে পড়ে। যারা জিহাদে পিছিয়ে পড়ে, তাদের জন্য এভাবে বলা হয়েছে,

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

যারা জিহাদের সময় বসে থাকে তাদের তুলনায় যারা নিজেদের ধন ও সম্পদ বিলিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চাসনে আসীন করেছেন।[১৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা জিহাদ করে তাদের পরিবর্তে যারা জিহাদ করে না, তাদের জন্য الْقَاعِدِيْنَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং জিহাদ কর্মপ্রচেষ্টা এবং জিহাদ-বর্জন অলসতার লক্ষণ। জিহাদের জন্য সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উৎসর্জনের উদ্যোগ সফল হয়। এ জন্য যারা অলসতা প্রদর্শন করে, তাদের জন্য قَاعِدٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

১৭. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৭৮।
১৮. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৯৫।

قَاعِدٌ ও قَائِدٌ এর মাঝে পার্থক্য

قَاعِدٌ শব্দের ع-এর স্থলে ء বসানো হলে শব্দটি হয় قَائِدٌ। যার অর্থ- নেতৃত্ব দানকারী। قِيَادَتْ তথা নেতৃত্বের জন্য প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ দরকার। সুতরাং قَائِدٌ তথা নেতা যদি আলস্য ও কুঁড়েমির শিকার হয়, তাহলে সে আর নেতৃত্বের উপযুক্ততা রাখে না। ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সামাজিক কার্যক্রমে এসব 'কয়েদ' (قَائِدٌ) তথা নেতাগণ তখন দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে قاعد-এ পরিণত হন। তখন এটা নিম্নের শ্লোকটি মনে করিয়ে দেয়:

چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی

–কা'বা ঘর যদি কুফরির বীজ উৎপাদন করে, তাহলে মুসলমানিত্বের অস্তিত্ব কোথায়!

জিহাদ শুধু তীর-তরবারি-ধনুকের নাম নয়

সাম্প্রতিক সময়টা অধঃপতনের শেষ প্রান্তে উপনীত। চেষ্টা ও কর্মস্পৃহা নিষ্প্রভ হতে চলেছে। স্বল্পসংখ্যক ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাগণ অপদার্থ সেজে নিরর্থক কর্মকাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত। জিহাদের প্রাণ ও আত্মা ধূসরিত হয়ে পড়েছে। কুরআন মাজিদে জিহাদের স্পষ্ট ধারণা বিবৃত হয়েছে। জিহাদ তরবারি ও বন্দুক উত্তোলনের নাম নয়; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে উচ্চকিত রাখার জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করে, সকাল-সন্ধ্যা এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কোনোরূপ কার্পণ্য করে না, সে ব্যক্তির প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদে গণ্য হবে। আর যারা শুধু মুখে জিহাদের ফুলঝুরি উড়ায়, কর্মে তার কোনো প্রভাব থাকে না, তারা কখনোই জিহাদকারী নয়। আল্লামা ইকবাল তার বিবরণে কতোই না চমৎকার বলেছেন!

تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

তোমাদের উত্তরসূরি উচ্চাঙ্গের ছিলো;
তোমরা কী? হাতে হাত বেঁধে আগামীর কথা ভাবো।

লোককথায় প্রচলিত আছে, پدرم سلطان بود (আমরা বাদশাহর উত্তরসূরি)- এ কথায় আমরা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করি এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ ধারণা ও পরিকল্পনায় চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করি। আমরা নির্লজ্জের মতো আল্লাহর

অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি, অথচ কাজের কাজ কিছুই করি না। আমরা মনে করি, আমাদের ভাগ্য বিনা পরিশ্রমে নির্ণিত হবে; এটা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষণীয় বিষয় যে, আল্লাহ মানুষের ভাগ্য নিজেদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

–আল্লাহ মানুষের ভাগ্য ততোক্ষণ বিবর্তিত করেন না, যতোক্ষণ তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে না।[১১]

- আল্লামা ইকবাল বলেন,

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

মানুষের কর্ম নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করে;
প্রতিজন জাতির ভাগ্য-নির্ধারণের মধ্যমণি।

এটা প্রকৃতিগত বিষয় যে, সে-সব জাতির ভাগ্যোন্নয়ন ঘটে না, যারা স্বভাবজাত অলস ও অতৎপর; স্বার্থপরতা, উদ্দেশ্যপ্রণোদনা যে-সব জাতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, তারা কখনো ভাগ্যের উৎকর্ষ ঘটাতে পারে না। যে জাতি কপটতা, অনিষ্টতা ও প্রতারণার মতো দূষণীয় স্বভাবকে আকড়ে থাকে; লুণ্ঠন, হত্যা-কাণ্ডের মতো হালাল-হারাম নির্বিশেষে ভক্ষণ, অপরের অধিকার-হরণ, ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য প্রদান যে জাতির শোণিতধারায় প্রবাহিত, আল্লাহ তাদের অবস্থাকে কখনো উন্নীত করেন না।

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جسکو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

যারা নিজের ভাগ্য-পরিবর্তনে উদ্যোগী নয়, আল্লাহ তাদের কোনো সহযোগিতা করেন না। অস্তিত্বের দফতরে কেবল সে জাতিই নিজেদের নামকে সমুন্নত ও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করতে পারে, যারা ক্ষুদ্র বাসনার বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তম লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিতে পারে।

---

[১১]. আল কুরআন : সূরা রা'আদ, ১৩:১১।

সাহাবিদের উৎসর্গের এক ঈমান-বর্ধক ঘটনা

এক যুদ্ধে কতিপয় সাহাবি প্রচণ্ডরূপে আহত হন। আঘাতের তীব্রতায় তৃষ্ণার্ত সাহাবিদের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। যখন এক তৃষ্ণার্তের সামনে পানির পাত্র উপস্থিত করা হলো, ইতোমধ্যে আরেক তৃষার্তের চিৎকার ভেসে এলো। প্রথম ব্যক্তি পানির পাত্র সরিয়ে অপর ব্যক্তিকে দেওয়ার আবেদন করে। দ্বিতীয় জনের কাছে পাত্র নিতেই রণক্ষেত্রের কোনো প্রান্ত হতে আরেক জনের চিৎকার ভেসে আসে। এতে দ্বিতীয় জন মুমূর্ষু অবস্থায় পরের জনকে পানি দিতে বলে। এভাবে তৃতীয় জনের কাছে পানি পৌঁছানোর আগেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। অবশেষে দ্বিতীয় ও প্রথম জনের পান করার আর সুযোগ থাকলো না; তারাও শাহাদাত বরণ করেন।

এভাবে উৎসর্গ-বিসর্জনের স্পৃহা যে-সব জাতির বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের ভাগ্য-উৎকর্ষের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

অপরের কর্মকাণ্ড ছেড়ে নিজের কাজে মনোযোগী হওয়াই শ্রেয়

জাতি হিসেবে আমরা নিজেদের বদনে বহুরূপের পসরা সাজাতে অভ্যস্ত। আমরা অন্যের কাছ থেকে বিশ্বস্ততা ও উৎসর্গ আশা করি; অথচ নিজেরা মিথ্যে, প্রতারণা ও কপটতায় আড়ষ্ট হয়ে আছি। অন্যের নিন্দা ও খুঁত-সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত; অথচ নিজেদের কর্মে চরম অনীহ। অপরের বক্ষে সমালোচনার তীর নিবদ্ধ করি, কিন্তু নিজের ভুল-ভ্রান্তি পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয় না। এ কারণেই আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হলে অপরের ভ্রান্তি-দুর্বলতাকে এড়িয়ে চলতে হবে; বরং আত্মসমালোচনার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বাহাদুর শাহ জফর'র এক প্রসিদ্ধ শ্লোক–

نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

যারা নিজের দোষের খবর নেই, দেখে অন্যের দোষ;
নিজের পাপে চোখ পড়লে, দেখে না কোনো দোষ।

নিজের মাঝে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়তে পারলে অপরের দোষ দেখার সুযোগ থাকে না; তখন মানুষ নিজের হিসেব মিলাতে তৎপর থাকে। জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাইলে প্রথমে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যকে আত্মসমালোচনার পথ সুগম করতে হবে। প্রত্যেকের নিজের বিবেকের আদালতে এই বিবেচনা থাকা দরকার যে, আমার খাবারে হালাল ও হারাম কিভাবে মিশ্রিত হচ্ছে; আমি কতো মানুষের অধিকার হরণ করেছি; কতো

জনকে তাদের নির্ধারিত অংশ হতে বঞ্চিত করেছি এবং হয়রানির শিকারে পরিণত করেছি। দিনশেষে ঘুমানোর পূর্বে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পর্যবেক্ষণ করে তাওবা করা দরকার এবং পরবর্তী দিনে ভিন্ন কিছু করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যদি এরূপ প্রচেষ্টাকে সম্মিলিত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে নিশ্চিতই এক শক্তিশালী বিপ্লব বেগবান হবে, যা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। এই جهاد بالنفس (আত্মার জিহাদ)-এর দাবি হলো- নির্জন-লোকালয় এবং বাহ্য-অভ্যন্তরের পার্থক্য যেন দূরীভূত হয়। আমরা যেন সবসময় নিজের বিশ্বস্ততা ও সততার প্রতি সতর্ক থাকি এবং যেন মিম্বরের ধ্বনি কর্মক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হয়।

কুরআনে جهاد بالمال তথা সম্পদের জিহাদের প্রাধান্য ও পূর্বিতা

কুরআন মাজিদে- فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ !خ ও وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ !خ প্রভৃতি আয়াতে সম্পদের জিহাদের কথা প্রথমে আনা হয়েছে এবং জীবনোৎসর্গের আলোচনা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে। এসব আয়াতে কুরআন মাজিদ সূক্ষ্ম ও যৌক্তিক বিন্যাসে সম্পদের জিহাদের পূর্বিতাকেই প্রমাণিত করছে। সম্পদের জিহাদ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যে-সব সম্পদ তোমরা অর্জন কর, তা থেকে কিছু অবশিষ্ট রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করো- দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায়। এসব সম্পদ তোমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। বিলাসিতা ও জীবনের অর্থহীন মানোন্নয়নে ব্যাপৃত থেকো না; প্রাপকদের অধিকার প্রদান এবং অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজনে ব্যয় করার বাসনা তৈরি করো। যদি এটা নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন, তবে ধরে নিন- আপনি বিজ্ঞানময় কুরআনের নির্দেশানুসারে জিহাদের সূচনা করতে পেরেছেন, যার ভিত্তি সম্পদ-উৎসর্জনের উপর।

তাকওয়া ও সম্পদের জিহাদ

তাকওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ মানুষের মস্তিষ্কে এই ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও নামাজের পর আল্লাহর পথে সম্পদের ব্যয় অপরিহার্য। এই পথ অনুসরণ করেই কুরআন মাজিদ মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শনের ভূমিকা পালন করেছে। সুরা ফাতিহার পরে কুরআনের সূচনালগ্নে এ নির্দেশনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুরা বাকারার শুরুতে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বাক্যাংশে প্রথম বারের মতো মুত্তাকিদের জন্য নির্দেশনা এসেছে এবং এতে হিদায়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

–যারা অদৃশ্যজগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায আদায় করে, এবং আমার সরবরাহকৃত উপার্জন হতে তারা ব্যয় করে।[২০]

কারা এই মুত্তাকি ও খোদাভীরু? সমস্ত সংশয় বিদূরিত করার জন্য কুরআন মাজিদে এসব মানুষের স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। তারা সে-সব লোক, যারা না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহর দেওয়া সম্পদ হতে তারই পথে ব্যয় করে। তাকওয়াময় জীবনের জন্য যে-সব শর্ত রয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় হচ্ছে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ –যারা ঈমান ও নামাজের পর আল্লাহর পথে নিঃসংকোচে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুত্তাকি। কুরআনে বর্ণিত তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কোনো ব্যক্তি মুত্তাকি হতে পারে না যদি সে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় না করে, যদিও সে রাত জেগে নফল প্রভৃতি পড়ে, এবং দিনে তাসবিহ-তাহলিল যিক্র-ফিক্রে মশগুল থাকে। তিলে তিলে যে ব্যক্তি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, যারা কারুনের মতো কৃপণ, তারা কখনো মুত্তাকি হতে পারে না। 'মুত্তাকি' শব্দ কেবল তাদেরই শোভা পায়, যারা ঈমান ও সালাতের পর দুঃস্থ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের সহায়তায় সম্পদ ব্যয় করে, আর আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় সম্পদ বিলিয়ে দেয়।

সম্পদ ব্যয়ের ধারণাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে কুরআন মাজিদের এক স্থানে হযরত আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর আলোচনা এসেছে এভাবে–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾

–জাহান্নাম হতে ওই মুত্তাকিকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে আত্মার পবিত্রতায় সম্পদ ব্যয় করে।[২১]

এখানে মুত্তাকির জন্য সম্পদ ব্যয়ের অপরিহার্যতা প্রমাণিত।

উক্ত আয়াতের আলোকে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়কারীই সবচেয়ে মহান মুত্তাকি; অধিকন্তু এটা জাহান্নাম হতে মুক্তি দানের নিশ্চয়তা দেয়। যদি কুরআনের দৃষ্টিতে এটাই মুত্তাকি হয়ে থাকে, তাহলে অপর পক্ষে যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার পরিবর্তে বিনিদ্র প্রহরায় থাকে,

[২০]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৩।
[২১]. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:১৭-১৮।

এরূপ কৃপণের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবধারিত। কুরআন মাজিদের অন্য জায়গায় এটার বিবরণ এভাবে এসেছে–

ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝٣ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝٦

–যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং গুণে গুণে রাখে; তারা মনে করে, সম্পদ তাদের চিরসঙ্গী, কখনো না! তারা নির্ঘাত নিক্ষিপ্ত হতে হুতামায় (জাহান্নামের একটি স্তর)। তুমি কি জানো? হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।[২২]

কুরআন মাজিদ বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করছে যে, যারা হালাল-হারাম নির্বিশেষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, তারা যেন মনে না করে যে তারা জাহান্নামের দগ্ধকর আগুন হতে রক্ষা পাবে। এটা কখনোই না! তারা উল্টো বিকৃত পথে অনন্তকাল ধরে জ্বলতে থাকা জাহান্নামের অনলে উৎক্ষেপিত হতে।

যারা নিজের কাছে সম্পদের সমাহার তৈরি করে, সোনা-রুপার স্তূপ ঘটায়, আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদের বেকারত্ব নিরসনে সম্পদ ব্যয় করে না, তাদের ব্যাপারে কুরআন মাজিদে এ ধমক এসেছে–

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

–যারা সোনা ও রুপা একত্র করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বিভীষিকাময় আজাবের সংবাদ শুনিয়ে দাও।[২৩]

<u>সম্পদের জিহাদের অগ্রবর্তিতার কারণ</u>

<u>জীবন দিয়ে জিহাদ করার পূর্বে সম্পদের বিনিময়ে জিহাদ করার অবস্থান</u>

জীবন দিয়ে জিহাদ করার সুযোগ ক্রমাগত আসে না; কদাচিৎ আসে এ সুযোগ। কিন্তু আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার সুযোগ প্রায়শঃ পাওয়া যায়। এ

---

২২. আল কুরআন : সূরা হুমাযাহ, ১০৪:২-৬।
২৩. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৩৪।

ICWWGd-gnvejv` nvwme Avj-nvwmg

জন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছি, তা শুধু তোমাদের প্রাপ্য নয়; সেখানে আমার ওসব বান্দাদেরও অধিকার রয়েছে, যারা এসব থেকে বঞ্চিত। তোমাদের সম্পদে তাদের অধিকার নিহিত রয়েছে। অথচ তাদের দীনতার এই অবস্থা যে, তারা এক বেলা আহারের জন্য ত্রস্ত থাকে। جِهَادُ بِالْمَالِ (সম্পদের জিহাদ) মানুষের গোটা জীবনকে বেষ্টন করে আছে; এটা আর্তমানবতার পথকে সুগম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে জীবন দিয়ে জিহাদ করার সুযোগ মানুষের জীবনে কেবল একবারই আসে।

সম্পদের জিহাদ ও জীবন-জিহাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা আমরা অনেক সময় জীবনের প্রকৃত ক্ষেত্রে পেয়ে যাই। আমরা দেখি এবং প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে পড়ি- অপরাধীরা কোনো সম্পদশালীর কাছে অর্থ দাবি করে; আর তারা জীবন-রক্ষায় দশ বিশ লাখ অর্থ বিলিয়ে দেয়। জীবন অর্থের চেয়ে মূল্যবান; জীবনের জন্য মানুষ যেকোনো মূল্য দিতে পারে। জীবন মানুষের অমূল্য সম্পদ, এমনকি পায়ের কিঞ্চিত আঘাতের জন্য মানুষ অগুন্তি অর্থও খরচ করতে পারে।

সম্পদের জিহাদে কোনোরূপ শিথিলতার সুযোগ নেই। কুরআন মাজিদ এ জন্যই জিহাদের ক্ষেত্রে এটার প্রাধান্য বিবৃত করেছে। অভাব ও দারিদ্র্য মানুষের মৌলিক সমস্যা, যা সমাধান না করে সামাজিক সাফল্যের স্বপ্ন অর্থহীন। ইসলামি শাসনব্যবস্থা এমন এক সামাজিক কাঠামোর নির্দেশনা দেয়, যা সংকোচন-অতিরঞ্জন, গোত্র ও শ্রেণিবৈষম্যের অভিশাপ হতে মুক্ত থাকবে, যেখানে ধনীর জন্য শুধু সম্পদের পাহাড় এবং অভাবগ্রস্তের জন্য শুধু দারিদ্র্যের কষাঘাত থাকবে না।

আল্লামা ড. ইকবাল এটাকে এভাবেই বুঝিয়েছেন-

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک وصاف
منعموں کو مال ودولت کا بناتا ہے امیں
সম্পদকে কালিমামুক্ত ও করে সাফ;
অনুগ্রহশীলকে করে বিত্তের জিম্মাদার।

এভাবেই কোনো সমাজব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে, যা প্রকৃত অর্থে মানবিক সমতা ও সম্প্রীতির উপর নির্মিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে জিহাদের সাধারণ ধারণার পাশাপাশি জিহাদের প্রকারভেদের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আমরা ধারাবাহিকভাবে সম্পদের জিহাদের অবতারণা করেছি, যা কুরআন ও হাদিসের আলোকে এখন বিস্তৃত পরিসরে সাজাতে যাচ্ছি।

জীবন-জিহাদের আগে সম্পদের জিহাদের অবস্থান, এর দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, আল্লাহর বাণীকে উন্নীত রাখার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ মানুষের জীবনে কদাচিৎ আসে, অথচ সম্পদের জিহাদ মানুষের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই যে জিহাদ পুনর্বার আসে, কুরআন মাজিদে তা পূর্বে এসেছে এবং যা কখনো কখনো আসে, তা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। এ দর্শনের ভিত্তিতে ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ, জীবন বিসর্জন দেওয়ার সময় যখন আসবে, তখন দেখা যাবে; নিজের ইচ্ছা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে চাও, তো আগে আমার রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে দেখাও। এটা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। যদি এই নিম্নস্তরের কাজে তোমরা নিজেদের দাবির প্রমাণ দিতে পারো, তবে তোমাদের পরবর্তী দাবিও সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে, অন্যথায় আল্লাহর পথে জীবন বিসর্জন দেওয়ার দাবি নিরর্থক হয়ে পড়বে।

জিহাদে কল্যাণ ও অকল্যাণ সুষুপ্ত থাকে

জিহাদের অর্থে অবিরাম সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্ত তৎপরতা নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যে শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়েছেন, তার পুরোপুরি ব্যবহারের নামই হলো জিহাদ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ এমন একটি নেয়ামত, যা আল্লাহ তার বান্দাদের দান করেছেন; এটা আল্লাহর পথে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্তরের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য ছাড়া, পার্থিব ও বস্তুগত সুবিধা ব্যতিরেকে, ধর্মের উৎকর্ষ-সাধন এবং আল্লাহর বান্দাদের অভাব দূরীকরণে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার নামই হলো জিহাদ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

–তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে; এটা তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা জানতে।[২৪]

উপরিউক্ত আয়াতে ذلكم خير لكم দ্বারা মানবজাতির জন্য সম্পদ ও প্রাণের জিহাদকে কল্যাণের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, যদি তোমরা বাস্তবতার সাথে পরিচিত হতে পারো, তবে আলস্যের সেই পর্দা সরে যাবে, যা তোমাদেরকে অপরিণামদর্শী হয়ে সম্পদের পিছু ছোটার মোহ অন্ধ করে রেখেছে। যখন তোমাদের সামনে এই বাস্তবতা বিকশিত হবে, তখন তোমরা বুঝতে পারবে, সম্পদকে তিলে তিলে পুঞ্জীভূত রাখার তুলনায় অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। অপর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, মানুষের মাঝে সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া সহযোগিতার একটি ধরণ। এ সহযোগিতাই জিহাদের ভিত্তি, যা কুরআনের আলোকে কল্যাণ ও খোদাভীরুতার অপরিহার্য শর্ত। এটা নিম্নবর্ণিত আয়াতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সহযোগিতা কল্যাণকামনা ও খোদাভীরুতার সাথে হতে হবে, অপরাধ ও পাপের সাথে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

–কল্যাণ ও খোদাভীরুতার কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও অপরাধের কাজে নয়।[২৫]

সহযোগিতা ও অসহযোগিতার স্পষ্ট মাপকাঠি

আল্লাহ তা'আলা সহযোগিতা ও অসহযোগিতার স্পষ্ট মাপকাঠির বিবরণ দিতে গিয়ে মু'মিনদের জন্য اَلْبِرُّ, اَلتَّقْوَى, اَلْإِثْمُ ও اَلْعُدْوَانُ-এ শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, অপরকে সহযোগিতা করা দরকার; তবে তা হতে হবে কল্যাণ ও ভালো কাজে, অপরাধ ও লঙ্ঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করা যাবে না। শরীয়তের পরিধিতে এমন কিছু কাজ রয়েছে, যা পালন করা অপরিহার্য, যেমন- নামায, রোজা, হজ্জ প্রভৃতি- এসব কাজে বাহ্যত সহযোগিতার বিষয়টা দৃশ্যমান নয়। এসব অবশ্য ভালো ও কল্যাণের কাজ, কিন্তু এসব আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান কেবল পালনকারীর জন্য নির্ধারিত; সাধারণত অপর ব্যক্তি সরাসরি এর উপকার পায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি মাঝ রাতে

---

[২৪]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৪১।
[২৫]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:২।

উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, অথবা পবিত্রতার সাথে তাসবিহ-তাহলিলে মগ্ন থাকে, তাহলে এটা যে ভালো ও শুভ কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কাজের বরকতে গোটা সমাজ উপকৃত হবে। কিন্তু সহযোগিতার সেই প্রায়োগিক পদ্ধতি, যা কুরআন মাজিদ আমাদের ভেতরে উপ্ত করতে চায় তা কেবল এমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে, যাতে সমাজের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। অনুরূপভাবে অপরাধ ও পাপ কাজে অসহযোগিতা করার অর্থ হলো, যেসব কাজে মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাতে অংশগ্রহণ না করা। আমরা প্রায়শঃ এমন সব মানুষকে দেখি, যারা মানুষকে ক্ষতিকর কাজে সহযোগিতা করে। কুরআন মাজিদ এ জাতীয় সহযোগিতাকে স্পষ্টরূপে নিষেধ করেছে। প্রসঙ্গত এ কারণে স্বজনপ্রীতির নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মনে রাখা দরকার, আত্মীয়-স্বজনকে এমনভাবে সহযোগিতা করা, যেন তাদের উপকার হয় এবং অপরের ক্ষতি না হয়, তাহলে এটা স্বজন-প্রীতি হবে না। বরং এটা আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিধানে গণ্য হবে। এ জাতীয় সম্পর্করক্ষণই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অভ্যাস ছিলো, যে কারণে বিরোধীরা তাকে স্বজন-প্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে গিয়ে যদি অপরের অধিকার বিনষ্ট না হয়, তাহলে এটা দোষের কিছু নয়; বরং এটা প্রণোদিত আচরণ। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যা দেখতে পাই, মেধা ও যোগ্যতাকে এড়িয়ে সুপারিশের ভিত্তিতে যে নিয়োগ দেওয়া হয় তাতে নিশ্চিতভাবে অন্যের অধিকার বিনষ্ট হচ্ছে। কাজেই এটা বেআইনি ও স্বজন-প্রীতি। এটা কখনো সাদকার পর্যায়ে পড়ে না; বরং এটা পাপ ও অপরাধ।

কুরআনের আলোকে কল্যাণ ও তাকওয়ার স্বরূপ

উপরে বর্ণিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসিরে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কল্যাণ ও তাকওয়া এমন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকারে আসে। যা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকারে আসে না, বরং আত্মিক অগ্রগতি ঘটায়, তা এ ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়টা স্পষ্ট করতে গিয়ে কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে–

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

–তোমরা পুরোপুরি কল্যাণে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না।[২৬]

[২৬]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৯২।

এই আয়াতে কুরআন মাজিদ কল্যাণের ধারণার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভঙ্গিতে এ সূক্ষ্ম বিষয় বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা কল্যাণের কাছেও যেতে পারবে না, যদি নিজেদের প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে না পারো। حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ- এখানে কল্যাণের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের না-বোধকতা এসেছে, যা মানুষের উপকারে আসে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের ভালো কাজ, রুকু, সেজদা, তাসবিহ আমার প্রভুত্বকে বিন্দু পরিমাণ বাড়াতে পারবে না; আর যদি তোমরা এসব ছেড়ে দাও, তবু আমার প্রভুত্ব ও বড়ত্ব কোনোরূপ হ্রাস পাবে না। যদি তোমরা ভালো কাজ আমাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কর এবং আমার সৃষ্টির ব্যাপারে অসতর্ক থাকো, তাহলে আমার কাছে তোমাদের এসব ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই। আমি এসব ভালো কাজের মুখাপেক্ষী নই, যা আমার সৃষ্টির উপকার সাধন করে না। তোমরা যা ইচ্ছে করতে থাকো, তোমরা যদি তোমাদের সম্পদ -যা তোমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়- আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় ব্যয় না কর, তাহলে তোমরা কখনো আমার কাছে ভালো হতে পারো না।

কুরআন মাজিদ 'কল্যাণের' নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহর বান্দাদের অনুপাতে নিজেদের কর্মপদ্ধতির পরিমাপ করবো এবং এটা দেখবো যে, আমরা সৃষ্টির সাথে কীরূপ আচরণ করছি; সৃষ্টির প্রতি আমরা কতোটুকু মনোযোগী। মসজিদে-সমাবেশে যেসব ধারণার কথা আমরা বলে বেড়াই, তা যদি কুরআনের আলোকে তুলনা করে দেখি, তাহলে বাস্তব জীবনে এর বিরোধ ছাড়া কিছুই পাবো না। বরং এটা ببیں تفاوت رہ از کجا وتا بکجاست- এর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

আমরা জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, প্রতি বছর হজ্জ ও ওমরা পালন করি, অজিফা-তাসবিহ প্রভৃতি যেন আমাদের দৈনন্দি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে; কিন্তু দুর্গত ও অভাবগ্রস্তদের পক্ষ থেকে যেসব দায়িত্ব আমাদের উপর আবর্তিত, তাতে আমরা বিশ্রী রকমের অবহেলা প্রদর্শন করি। যদি আমরা এ ধরণের পরিস্থিতিকে কল্যাণ ও ভালো মনে করে থাকি, তাহলে এটা নির্ঘাত ভ্রান্তি হবে। আল্লাহর কাছে এসব ভালো কাজ মূল্যহীন; তিনি তা আমাদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে, নিজেদের ধারণায় যা তোমরা ভালো মনে কর, তার কোনো মর্যাদা আমার কাছে নেই। কোনো নামাজি, হাজি বা দানশীল যদি অপরের উপকারে না আসে, তাহলে আল্লাহর

কাছে তার কর্মসমূহের প্রতিদান শূন্য। কুরআনের আলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কর্মসমূহ ভালো বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ দুঃস্থ মানুষের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হবে না, ক্ষুধার্থদের আহারের ব্যবস্থা হবে না এবং আর্তমানবতার দুর্দশার অবসান ঘটবে না। এটা তখনই সম্ভাবনার মুখ দেখবে, যখন তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ তার সৃষ্টির কল্যাণে ও উপকারে ব্যয় করবে। কল্যাণের যে ধারণা কুরআন মাজিদ মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করেছে, তা অপর একটি হাদিসে আরো স্পষ্ট হয়ে আসে।

এক সাহাবির কুরআন-ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি

হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবি ছিলেন। মসজিদে নববির পাশে তার এক খণ্ড জমি ছিলো। এটা দুটো কারণে তার অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। প্রথমত, এটা উন্নতমানের ছিলো এবং দ্বিতীয়ত, এখানে মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন এবং ফল খেতেন, পানি পান করতেন। কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের মর্ম অনুধাবন করে এক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী কল্যাণ অর্জন করতে চাই। আমার এই বাগান আপনি রেখে দিন এবং পরিবর্তে আমাকে কল্যাণ দান করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু তালহা, এই বাগান আমাকে অর্পণ করো না, বরং নিজের কাছে রেখে দাও এবং তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করো। এটা আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হবে।

হাদিসে আছে, হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওখানে দাঁড়িয়েই বাগানটা আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এটা পৃথিবীর মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে যাবে অনন্তকাল ধরে।

দুটো লক্ষণীয় বিষয়

উপরিউক্ত হাদিসের আলোকে দুটো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় সাহাবি হযরত আবু তালহাকে এ কথা বলেন নি যে, এটা নফল কাজ এবং যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের হক আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাগান দান করে দেওয়া জাকাতের তুলনায় ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবিকে এ কথাও বলেন নি যে, জাকাতের পাশাপাশি

অন্যান্য যে-সব দান করবে, তা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ; তবে যদি না কর, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেন নি যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পুরোটা বাগান দান করে দেওয়ার কী প্রয়োজন? অল্প অংশ দিয়ে বাকিটা নিজের কাছে রেখে দাও, অথবা এর উপার্জন দুর্গতদের মাঝে বণ্টন করে দাও, এতে তুমি উপযুক্ত প্রতিদান পাবে।

এখানে এ বিষয়টা স্পষ্ট করাই উদ্দেশ্য যে, কল্যাণের যে চিত্র আমরা মস্তিষ্কে এঁকে বসে আছি, তা কখনো রাসূল-প্রদত্ত চিত্র নয়। এ ধরনের চিত্রের সাথে প্রায়োগিক জীবনের সাযুজ্য অনুপস্থিত। মনে রাখা দরকার, সম্পদের মাঝে যাকাত ব্যতিরেকে আরো অনেক হক রয়ে গেছে। যাকাত তো কেবল ন্যূনতম পরিমাণ, যা মুসলমানিত্বের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এ পরিমাণ জাকাতের অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হয়ে যায়। যেমন হযরত আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিহাদ অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। মুসলমানের সম্পদে যাকাত ছাড়াও অনেক হক রয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে,

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

–সম্পদে যাকাত ছাড়াও অনেক হক রয়েছে।[২৭]

সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার

সাম্প্রতিক সময়ে ভালো ও কল্যাণের যে চিত্র আমাদের সমাজে প্রচলিত, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত এবং কুরআন-নির্দেশিত পন্থার পুরোপুরি পরিপন্থী। ভালো কাজে একে অপরের সহযোগিতা করার অর্থ এই যে, মানুষ অপরের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে এবং মানুষের আর্থিক সমস্যা সমাধানে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করবে। এটা করতে গিয়ে কেউ যেন সাহায্যগ্রহণকারীকে নিজের ভৃত্য ও করুণাদাস ভেবে না বসে। এটা যেন প্রত্যাশা করা না হয় যে, সাহায্যগ্রহণকারীকে ভিক্ষুকের মতো মাথানত করতে হবে। কারণ ইসলাম

---

[২৭]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা-আ ফীল মালে হাক্কান সিওয়ায্ যাকাত, ৩:৬৮, হাদিস : ৫৯৬।
খ) দারে কুতনী : আস্ সুনান, বাবু তা'জিলিস্ সদকা ক্বলাল হাওলি, ৫:২৬৯, হাদিস : ২০৩৯।
গ) আবু নঈম ইস্পাহানী : মা'রিফাতুস্ সাহাবা, ২৩:৪২৩।

মানুষের সম্মানকে সমুন্নত রেখেছে। বরং অসহায়দের এসব সাহায্যের অধিকার রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝

–আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত অধিকার রয়েছে- ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য।[২৮]

এতে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যাচ্ছে, ধনিক শ্রেণির সম্পদে ভিক্ষুক, অসহায় ও বঞ্চিতদের অধিকার নির্ধারিত আছে। সুতরাং প্রাপকের কাছে তার অধিকার পৌঁছে দেওয়া করুণা নয়, দায়িত্ব। এ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কেয়ামতের মাঠে প্রশ্ন করা হবে।

কুরআন মাজিদে এসব সম্পদশালীদের প্রতি কর্কশ ভাষায় ধমক এসেছে, যারা সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে, অথচ অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে তা বণ্টন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ۝

–যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং গুণে গুণে রাখে; তারা মনে করে, সম্পদ তাদের চিরসঙ্গী, কখনো না! তারা নির্ঘাত নিক্ষিপ্ত হতে হুতামায় (জাহান্নামের একটি স্তর)। তুমি কি জানো? হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।[২৯]

কুরআন মাজিদ সম্পদের পূজারিদের প্রশ্ন করে, মানুষের অধিকারের প্রতি অবহেলাপূর্বক গড়ে তোলা এই সম্পদের স্তূপ ও ব্যাংক ব্যালেন্স প্রভৃতি কি তোমাদের দোজখের আগুন হতে রক্ষা করতে পারবে? কুরআন নিজেই এর উত্তর দিচ্ছে। নাহ! কখনো না। যদি তারা এটা মনে করে থাকে, তবে এটা হবে তাদের ভুল ধারণা। لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ: তাদেরকে গ্রীবায় ধরে টেনে টেনে এমন আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হবে, যা অনন্তকাল ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসছে এবং সে আগুন তাদের অন্তরকেও দগ্ধ করে ছাড়বে।

[২৮]. আল কুরআন : সূরা মা'আরিজ, ৭০:২৪-২৫।
[২৯]. আল কুরআন : সূরা হুমাযাহ, ১০৪:১-৪।

এই মর্মান্তিক শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন করে কুরআন মাজিদ মানুষের অন্তরে এটুকু অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, সম্পদের কোনো অংশ কাউকে দেওয়া তার প্রতি অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার অধিকার। হাদিসে এবং সাহাবিদের ঘটনাবলিতে এমন অগুনতি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে তারা নিজ আহারের গ্রাস পর্যন্ত অপরকে দিয়ে দিতেন, অথচ এটাতে করুণা ভাবতেন না।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত হাসান ও হুসাইন অসুস্থ হলে তাদের আরোগ্যের জন্য হযরত আলী ও ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিন দিন রোজা রাখার মানত করেন। তারা সুস্থ হয়ে উঠলে রোজা রাখা শুরু হয়। প্রথম দিন ইফতারের জন্য কিছু যবের ব্যবস্থা করা হলো। ঠিক রুটি বানানোর সময় এক ভিক্ষুকের শব্দ ভেসে আসে। ইফতারের জন্য আনীত খাবার তাকে দিয়ে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থা। এক এতিমের অসহায় প্রার্থনা। সে দিন রুটি তাকে দিয়ে দেন। তৃতীয় দিন এক বন্দির প্রশ্ন তাদের নাড়া দেয়। অবশেষে পানি খেয়ে তারা ইফতার করেন। এসব নিশ্চয় কোনোরূপ অনুগ্রহ বা করুণা নয়; এটা আল্লাহর নির্দেশনা। আল্লাহ বলেন,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

–আর তারা আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ভিক্ষুক, অনাথ ও বন্দিদের অন্ন দান করে।[৩০]

এটা আল্লাহর ভালোবাসার স্বরূপ। যারা এ ভালোবাসার সাথে পরিচিত, তারাই এটা উপলব্ধি করতে পারে। উপরন্তু তারা জীবন বিসর্জনকেও নগণ্য মনে করে। কবি বলেন,

جاں دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

প্রাণ দিলাম, তবে প্রাণ তো তারই দেওয়া;
তবু সত্য হলো- হয় নি আদায় অধিকার।

প্রকৃত প্রেমিকদের জন্য জীবন উৎসর্গও কোনো ব্যাপার না। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও তারা ভালোবাসার পরমানন্দে নিমজ্জিত থেকে এটাকে সামান্য মনে করে। যদি সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে উপোস

[৩০]. আল কুরআন : সূরা দাহর, ৭৬:৮।

করতে হয়, তবু তারা এটা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। এমন প্রেমীদের জন্য বলা হয়েছে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

–নিতান্ত প্রয়োজনেও তারা অপরকে প্রাধান্য দেয়।[৩১]

এভাবেই তারা পৃথিবীবাসীর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সাহাবিদের জীবন অধ্যয়ন করলে সম্পদের এ জাতীয় জিহাদই পাওয়া যায়। তারা নিজের আহার অপরের মুখে তুলে দেয়। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিন দিন না খেয়ে থেকেও কোনো অভিযোগ ছিলো না; বরং তাদের অভিব্যক্তি–

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩

–আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে আহার দান করি; আমরা কোনো বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা আশা করি না।[৩২]

সম্পদের জিহাদ এবং আমাদের বিরূপ অবস্থা

আজ আমাদের সমাজের এ বীভৎস চিত্র যে, আমরা কারো প্রতি অল্পটুকু অনুগ্রহ করতে পারলেই তার ঢোল পেটাতে থাকি। মানুষ মুখে মুখে বলতে থাকে, 'আমি তার জন্য এই এই অনুগ্রহ করেছি, কিন্তু সে আমার সাথে এই কৃতঘ্ন আচরণ করেছে; আমার ভালো আচরণের পরিবর্তে সে আমার সাথে অসদ্ব্যবহার করেছে।' আল্লামা ইকবাল জাতি হিসেবে আমাদের এই শোচনীয় পরিস্থিরি প্রতি নির্দেশ করে বলেন,

ز قرآں پیش خود آئینہ آویز
دگرگوں گشتۂ از خویش بگریز

কুরআন হতে আত্মসম্মুখে প্রস্তুত করো দর্পণ
আত্মভোলা অন্যথা ছেড়ে করো তুমি পালায়ন।

এরূপ পরিস্থিতিতে যদি আমরা নিজেদের বিকৃতির সংশোধনী চাই, তবে আত্মমনোযোগী হয়ে আত্মসমালোচনায় মনোনিবেশ করা দরকার। যদি আত্মসংশোধনীর ভাবনা নিজের অন্তরে জাগ্রত না হয়, তবে সমাবেশ, বক্তব্য,

[৩১]. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৯।
[৩২]. আল কুরআন : সূরা দাহর, ৭৬:৯।

উপদেশবাণী কোনো কাজে আসবে না। দ্বীনের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারাই আসল কাজ এবং দ্বীনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই প্রকৃত লক্ষ্য।

দুটো অপরিহার্য বিষয়

কুরআনের বৈপ্লবিক পদ্ধতি এই দাবি উত্থাপন করেছে যে, ধর্মের মৌলিক শিক্ষা বক্ষ ও আত্মাপরম্পরায় মানুষের কাছে পৌঁছানো হবে, এবং কপটতা ও প্রতারণার যে পোশাক পরে আছি তা ছিন্ন করা হবে। ধর্মের মৌলিক রূপকে মানুষের সামনে বিকশিত করার যে অপরিহার্যতা বর্তমানে উপলব্ধ হচ্ছে, তা সম্ভবত আগে কখনো ছিলো না।

উপরের পুরোটা আলোচনায় দুটো কথাই বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে।

এক. কল্যাণ ও ভালোত্ব ততক্ষণ অর্জিত হবে না, যতক্ষণ আমরা দরিদ্র, অসহায় ও দুর্গতের সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করবো না।

দুই. যাদের জন্য ব্যয় করা হবে তাদের যদি করুণাতলে ভাবার মানসিকতা তৈরি হয়, তাহলে এর প্রতিদান শূন্য হবে। সুতরাং দান করার সময় অনুগ্রহ নয়, অধিকার মনে করে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি লোককথা প্রচলিত আছে, نیکی کر دریا میں ڈال: 'উপকার করো, আর ভুলে যাও।' কারো সাথে ভালো আচরণ করে তা ভুলে যান। গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, কারো সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে হয়; আল্লাহ না চাইলে কেউ ভালো কাজ করতে পারে না। এখন সমাজের লোকেরা কারুনের মতো বীভৎস বৈশিষ্ট্যে একে অপরের শ্রেষ্ঠত্বপ্রমাণে প্রতিযোগিতায় প্রমত্ত। তারা সম্পদের চূড়োয় সর্পরূপে বসে আছে; আত্মীয়-ঘনিষ্ট-সংশ্লিষ্টজনের অধিকারের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সমাজে এরূপ পেশাজীবী ও মজুরশ্রেণির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, যারা দিনের আহার উপার্জনে কতো হয়রানির শিকার; অথচ কতিপয় ধনিক শ্রেণি মিছেমিছি কতো সম্পদ নষ্ট করে চলেছে; দুর্গতদের প্রতি তাদের কোনো মায়া নেই। আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদ তারা নিছক বিলাসিতায় ব্যয় করে নির্দ্বিধায়। অজস্র অর্থ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জীবনের মানোন্নয়নের মতো অর্থহীন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হচ্ছে, অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ দু বেলা আহারের জন্য জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে আছে। অসহায় ও নিঃস্বদের মৌলিক অধিকারের প্রতি না সরকার উদ্দ্যোগী, না ধনিকশ্রেণি।

এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন সম্পদশালীর উপর ঈর্ষা করা দরকার, যাকে আল্লাহ সম্পদের পাশাপাশি তা আল্লাহর জন্য ব্যয় করার তাওফিকও দিয়েছেন। এটা এমন কাজ, যা সমস্ত নফল কাজ ও রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম।

দানবীর আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি

দানশীলতা ও বদান্যতা আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের জন্য নিঃসংকোচে ব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত নিচের হাদিস হতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়–

اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا،

–দানশীল আল্লাহর বন্ধু হয়, যদিও সে পাপাচারী।

কোনো গোনাহগার পাপাচারী ব্যক্তিও দানশীলতার কারণে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে থাকে।

এক যুদ্ধে কিছু অমুসলিম বন্দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত করা হলো। তাদের মাঝে এমন এক মহিলাও ছিল, যার বংশপরম্পরা চার-পাঁচ পিতৃসূত্রে হাতেম তায়ি পর্যন্ত পৌঁছে। হাতেম তায়ি ছিলেন প্রসিদ্ধ দানবীর। বদান্যতার কারণে এখনো তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। ওই বন্দি মহিলার খবর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন এবং বললেন, হে মহিলা, যেহেতু তোমার পিতা দানবীর ছিল, সেহেতু তোমাকে আজ মুক্তি দেওয়া হলো।

আমাদের জীবন তার জন্য উৎসর্গিত হোক! কয়েক পিতৃসূত্রে অতিবাহিত এক দানবীর পিতার সম্মান রক্ষার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়েকে মুক্তি দেন।

সেই দানবীর পিতার মেয়ের উত্তর শুনুন। মেয়েটি বললো, আমিও দানবীরের মেয়ে। আমি আমার সঙ্গীদের বন্দিশালায় ছেড়ে যেতে পারি না। তাদের বন্দিত্ব নিশ্চিত হলে আমিও সেই বন্দিত্ব গ্রহণ করবো। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেম তায়ির বদান্যতার কারণে সবাইকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদ প্রসঙ্গে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আমরা কুরআন-চিত্রিত بِرٌّ তথা কল্যাণ ও ভালোত্ব নিয়ে আলোচনা করছি। কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে ভালো ও কল্যাণময় কাজে কুরআনে সহযোগিতার নির্দেশ এসেছে তা ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ বান্দা সন্তুষ্টচিত্তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় সম্পদ-ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত হবে না। بِر তথা কল্যাণময় কাজের মাপকাঠি স্থির করার জন্য মানুষের বেকারত্ব ও অন্যান্য বঞ্চনা, বিষণ্নতা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সম্পদ-ব্যয়ে জড়িত থাকা অপরিহার্য। মনে রাখুন, এর অনুঘটক বা পটভূমি হতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ মানুষকে বহুবিধ সংকটের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং বিচিত্র ভালোবাসা ও মোহের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ

–মানুষের জন্য তাদের প্রবৃত্তির ভালোবাসাকে রসালো করা হয়েছে। তারা নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রুপার ভাণ্ডার, চিহ্নবিশেষিত ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেতখামারের প্রেমে উন্মত্ত।[৩৩]

উদ্ধৃত আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। কখনো স্ত্রী-বাচ্চাদের ভালোবাসায় তারা আকর্ষিত; কখনো সম্পদ ও পার্থিব উপকরণ তাদের সমস্ত মনোযোগকে বেষ্টন করে রাখে। ভালোবাসার এ স্বরূপ মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যের আভাস ছড়ায়, এবং এটাই রুচি ও মানবপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করে।

এটা অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়; আমরা এই ভার পাঠকের ঘাড়ে চাপাতে চাই না। তবে এটুকু বিষয় জেনে রাখা দরকার, মানুষের প্রকৃতির দুটো দিক বিদ্যমান:

---

৩৩. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪।

(১) বাহ্যিক প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْفِعْلِ),

(২) অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْقُوَّةِ) ।

(১) বাহ্যিক প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْفِعْلِ)

এটা মানুষের সেই প্রকৃতি, যেখানে প্রবৃত্তি, আকর্ষণ, ঝোঁক, আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব মোহ, সুবিধাবোধ, মান-মর্যাদা, পদলিপ্সা ও সম্পদ উপার্জনের মোহ মানুষকে আকৃষ্ট করে। এটা মানুষকে আপাদমস্তক অনুগামী করে ছাড়ে। ভালোবাসার এই প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরকে বশবর্তী করে তোলে; ফলে তারা অবনতমস্তকে এটার পিছু ছোটে।

(২) অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি (اَلْفِطْرَةُ بِالْقُوَّةِ)

এটা মানুষের ওই প্রকৃতি, যার প্রভাবে অন্তরের গহীনে খোদাপ্রেম উপ্ত হয়। মানুষের এই শক্তির আলোকে আল্লাহর একত্ববাদের অনুভূতি, আমানত ও ধার্মিকতার ধারণা, চরিত্র ও দায়িত্বপালন, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির প্রত্যয় এবং ভালো ও পুণ্য কাজের প্রতীতি জন্ম লাভ করে। এটা মানুষকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করে এবং প্রবৃত্তিক ও সংশয়াপন্ন শক্তিকে পদানত করে।

এই দু প্রকারের মানবপ্রকৃতির দাবি

উপরে বর্ণিত উভয় প্রকৃতির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাহ্যিক প্রকৃতি মানুষের মাঝে পার্থিব ভালোবাসার বীজ বপণ করে এবং বস্তুগত প্রবৃত্তি-পূরণে প্ররোচিত করে। অপর দিকে অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি মানুষের মাঝে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা এবং ভালো কাজের প্রতীতিকে জাগ্রত ও দৃঢ় করে। উভয় প্রকৃতির মাঝে বিরোধ ও বৈপরিত্যের সম্পর্ক; যেন উভয়ের মাঝে স্নায়ুযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান। বাহ্যিক প্রকৃতিতে উদ্দীপক শক্তি অবশেষে মানুষকে পাপাচার, কপটতা ও অবাধ্যতার পথে নিয়ে যায়; আর আত্মিক শক্তি কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে।

মানুষের মাঝে উভয় প্রকৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে বলা হলো, তুমি ও ফেরেশতার মাঝে এটাই পার্থক্য যে, তোমার জন্য দুটো পথই উন্মুক্ত; উভয় প্রকৃতির পূর্ণতাদানে তোমাদের জন্য সরণিকে উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছে। তোমরা ইচ্ছে মতো যেকোনো মত অবলম্বন করতে পারো। আর পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের সামনে কেবল একটি পথই বিদ্যমান; তারা কেবল কল্যাণের পথে অধিষ্ঠিত। পাপাচারের পথ সম্পর্কে তারা অনবগত। সততার পথ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ তারা মাড়াতে পারে না।

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হবার পেছনে এটাই কারণ যে, তাদের সামনে দুটো পথই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন পার্থিব মোহে পড়ে আল্লাহর ভালোবাসাকে দুর্বল ও গৌণ করে না রাখে এবং গর্হিত কাজের অনুসরণ করে মাওলাপ্রেমে বিমুখতা পোষণ না করে। ভালো-খারাপ উভয় পথ তাদের সামনে বিকশিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে মানুষের মাঝে পার্থক্য নিরূপিত হবে এবং পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তারা নিজেদের পথ নির্ণয় করতে পারবে। নিঃসন্দেহে দুনিয়া সংকটাগার এবং জীবন পরীক্ষাগার। এতে পদে-পদে, মোড়ে-মোড়ে সত্যপথ হতে বিচ্যুত হবার যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান।

পার্থিব মোহ ও আল্লাহপ্রেমের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা

যদি মানুষ পার্থিব মোহে প্রমত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, তবে আল্লাহর নির্দেশনা মতে তাকে জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

–অতঃপর আমি তাকে নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করবো।[৩৪]

নিম্নতম স্তরে পতিত হয়ে সে যেন মানবতার বৈশিষ্ট্য হতে চিরবঞ্চিত হলো। ইসলামি মতবাদের শিক্ষা মানুষের মস্তিষ্কে এই ধারণা জন্মাতে চায়, পার্থিব মোহকে পুরোপুরি পদানত করা। তবে তার নিশ্চিহ্ন করা মোটেই উদ্দিষ্ট নয়। কারণ এটা বৈরাগ্য। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো অবকাশ নেই। বরং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে পার্থিব ভালোবাসাকে আল্লাহর প্রেমের অনুগামী করা। সব মোহকে কেবল একটি মোহের অনুসারী করার অর্থ হচ্ছে, সন্তান-সন্ততি, সম্পদ, মর্যাদা ও পদলিপ্সা প্রয়োজনের সীমারেখায় আবদ্ধ করা। এতে পার্থিব প্রেম মাওলার প্রেমের কাছে গৌণ হয়ে থাকবে। যদি সব ভালোবাসাকে আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী করা যায়, তখনই কেবল أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ এর মতো উচ্চস্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার অনুঘটক

সম্পদ ব্যয়ের বিবিধ অনুঘটক থাকতে পারে। যেমন লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে সম্পদশালীরূপে আবির্ভূত হওয়া। এতে সে মানুষকে সম্পদ, মান-মর্যাদা, পদ ও বিত্ত-বৈভবের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারবে; অপরকে

৩৪. আল কুরআন : সূরা ত্বীন, ৯৫:৫।

করুণাদাসে পরিণত করতে পারবে এবং অসহায়দের বাধ্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারবে ।

সম্পদ-ব্যয়ের এসব অজুহাতকে উপেক্ষা করে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে । আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পদ বিসর্জনই মুখ্য হওয়া উচিত । অর্থাৎ মানুষ যখন যা ব্যয় করুক না কেন, সবসময় আল্লাহর তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে ।

গভীর পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, মাওলার জন্য সম্পদ তো কিছুই না; বরং জীবন, সম্মান সবকিছুও যদি তার জন্য উৎসর্জন করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে নির্দ্বিধায় তা-ই করা উচিত । সম্পদ-ব্যয়ের ক্ষেত্রে এটাই কুরআনের আলোকে إِنْفَاقٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়) । আল্লাহর পথে সম্পদ-ব্যয় শুধু কোনো উচিত কাজ নয়, বরং এটা জিহাদ । কারণ এটার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো কারণ নেই ।

কুরআনের দর্শন 'بِرٌّ'-এর বিস্তারিত তাৎপর্য

'بِرٌّ' তথা কল্যাণের ধারণা কুরআনের ভাষায় অত্যন্ত সুচারু ও বিরল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

–পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই ।[৩৫]

এখানে এ বিষয়টা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে রুকু, সেজদা, তাসবিহ, তাহলিল বা রাত্রিজাগরণে ভালো ও কল্যাণ সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনে এর বিস্তার এভাবে এসেছে–

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ

وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ

وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

৩৫. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৭৭ ।

অর্থ: বরং প্রকৃত ভালো সে, যে আল্লাহ, কেয়ামতের দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবিগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; এবং আল্লাহর ভালোবাসায় স্বজন, এতিম, দুঃস্থ, মুসাফির, ভিক্ষুক ও বন্দিদের অর্থ দান করে ।[৩৬]

ঈমানের পর আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । উক্ত আয়াতে প্রাপকদের একটি তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে । এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয় যে, সম্পদ ব্যয় করার পেছনে যদি শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সেটাই হয় جِهَادٌ بِالْمَالِ (সম্পদের জিহাদ) । যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তা পাপাচার ছাড়া কিছুই নয় ।

একটি প্রচলিত ভুলের সংশোধন

তাকওয়া ও কল্যাণ সংক্রান্ত কুরআন মাজিদ একটা স্পষ্ট ও সমন্বিত চিত্র পেশ করেছে । এই চিত্রের আলোকে মুত্তাকি হলো সেই ব্যক্তি, যে ফরযের পাশাপাশি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে । যদি কেউ শুধু তাসবিহ, দরুদ, অজিফা আর নফলকে তাকওয়ার ভিত্তি মনে করে, তাহলে এটা কুরআনের আলোকে ভুল । তাকওয়া দীর্ঘ নামায, রুকু, সেজদা, তাসবিহ-তাহলিল প্রভৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা কষ্টার্জিত সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার উপর নির্ভর করে ।

দিনে পাঁচ বার নামায ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালনপূর্বক কেউ যদি আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট-বিপদের সমাধানে এগিয়ে না আসে, বরং নামায ও অন্যান্য নফলের পাশাপাশি অপরের সম্পদ হরণের দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত থাকে, মানুষের অধিকার নষ্ট করতে সে লজ্জাবোধ করে না, তাহলে বুঝে নিতে হবে- তার তাকওয়া বলতে কিছুই নেই । আমরা দেখি, প্রথিতযশা কতো ধর্মপ্রচারক অপরকে সাদকা-খায়রাত, আল্লাহর পথে ব্যয় ইত্যাদির উপদেশ দেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে নিজের মাঝে এর কোনো প্রতিফলন নেই । এটা যেন এ রকম-

اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت

অন্যের জন্য ওয়াজ, নিজের জন্য সুসাজ ।

তাদের কর্ম কপটতায় কলুষিত । এ কারণেই তারা গোটা জীবন জুড়ে উপদেশ দিতে থাকেন, কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না ।

৩৬. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৭৭ ।

হাকীমুল উম্মতের মতে,

زباں سے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

–মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে কী অর্জিত হবে? যদি অন্তর ও দৃষ্টি মুসলমান না হয় তবে কিছুই অর্জিত হবে না।

কথা ও কাজের এই বিরোধ আমাদের মুসলমানিত্বের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। আফসোস! শত আফসোস!! রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র আজ আমাদের সামনে নেই।

শরীয়তের কোনো বিধান বা নির্দেশ কি এমন পাওয়া যায়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অথচ আমল করেন নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার জীবন আর কার হতে পারে? অথচ তাঁর দানশীলতা ও বাদান্যতার সামনে সাগরের বিশালতাও নগণ্য ছিলো। আমরা একটা অভিযোগ সবসময় করে থাকি; সেটা হলো ঘাটতি, দারিদ্র্য ও কঠিনতার অভিযোগ। অথচ আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ হতে এ কথা কখনো বোঝা যায় না যে, বেশি হলে দিতে হবে, অন্যথায় দিতে হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদারতার অবস্থাই ছিল অনন্য। এতে ন্যূনতা বা আধিক্যের সীমারেখা নেই। ইমাম তিরমিজির বর্ণনা মতে কোনো এক সময় নব্বই কিংবা সত্তর হাজার দিরহাম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হস্তগত হয়। তিনি এটা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করে মদিনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘোষণা দেন- অভাবগ্রস্তদের আসার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে মানুষের ভীড় জমতে শুরু করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে এ অর্থ বিলিয়ে দেন। নিমেষেই সমস্ত অর্থ বণ্টিত হয়ে যায়। বণ্টন-শেষে এক ব্যক্তি এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকেও কিছু দিন; আমি যেন আমার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভাই তুমি তো দেরি করে ফেলেছো।" কিন্তু ওই দরবার হতে কেউ খালি হাতে ফেরে না। তাকে বলা হলো, "তুমি বাজারে যাও এবং যা প্রয়োজন আমার নামে কিনে নাও।" হাদিসে এসেছে–

فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاهُ

–আমার কাছে কিছু (অর্থ) এলে আমি তা আদায় করে দেবো।[৩৭]

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের কর্ম ও আচরণে প্রতিফলিত করা দরকার। যদি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-প্রবর্তিত বিপ্লবের বাস্তবায়ন দেখতে চাই, তাহলে আমাদের প্রচার-প্রসারে তার অনুসৃত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। আমাদের চরিত্রে যতোদিন এই উৎসর্গের আঁচড় পড়বে না, ততোদিন অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে না। ফাঁপা বক্তব্য ও নির্জীব শ্লোগানে বিপ্লব সাধিত হয় না।

মুত্তাকির কুরআনি সনদ

ভাগ্যের বীভৎস পরিহাসে আমরা ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছি। ধর্মের সমগ্রতা (Totality) আজ বিলুপ্ত প্রায়। মুত্তাকির মাপকাঠি নিরূপণে কুরআনের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾

–মুত্তাকি ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে, যে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদ বিসর্জন দেয়।[৩৮]

কুরআন মাজিদে সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে মহান মুত্তাকি হবার পাশাপাশি জাহান্নাম হতে মুক্তি দেওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে। يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে। কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী যে ব্যক্তি রাত-দিন রুকু, সেজদাহ, ইবাদত প্রভৃতিতে মগ্ন থাকে, সে প্রকৃত মুত্তাকি নয়; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার পথে সম্পদ ব্যয় করতে থাকে, সে-ই প্রকৃত মুত্তাকি। যতোই সে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, ততোই সে অপবিত্রতা ও কপটতা হতে মুক্ত হতে থাকবে।

সম্পদের পবিত্রতা ও অপবিত্রতার একটি দৃষ্টান্ত

সম্পদের উদাহরণ একটি কূপের মতো, যার নিষ্কাশন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু থাকলে পানি পরিচ্ছন্ন থাকে। নিষ্কাশন-ব্যবস্থার ত্রুটি ঘটলে পানি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে যে পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য, তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

---

৩৭. তিরমিযী : আস্ সুনান।
৩৮. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:১৭-১৮।

অনুরূপভাবে মানুষের জীবনের উদাহরণ দেওয়া যায় কূপের সাথে; এতে হালাল পদ্ধতিতে উপার্জিত সম্পদ একত্র হবার পাশাপাশি বের হবার পদ্ধতি সুগম হলে সম্পদের অপবিত্রতা থাকে না। যদি এসব সম্পদ বের হবার পদ্ধতি রুদ্ধ থাকে, তাহলে হালাল পদ্ধতিতে উপার্জিত সম্পদও অপবিত্র হয়ে চারিত্রিক ও আত্মিক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা শুধু সম্পদের মালিককে ধ্বংস করে না, বরং এটা গোটা সমাজে ধ্বস সৃষ্টি করে।

সম্পদের ব্যাপারে কুরআন মাজিদের দর্শন হচ্ছে ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ (–আত্মাশুদ্ধির লক্ষে সম্পদ ব্যয় কর) যতোই সম্পদ আসবে, ততোই দান করতে হবে। সম্পদের সরবরাহ বন্ধ থাকলে সবকিছু স্থির হয়ে পড়বে এবং জীবন অপবিত্রতার ভারে নুইয়ে পড়বে। তখন রাতের পর রাত নফল আর তাহাজ্জুদ কোনো কাজে আসবে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদ-ব্যয়ের সাথে পবিত্রতার সম্পর্ক, আর সম্পদের পুঞ্জীভূতকরণে অপবিত্রতা অনিবার্য।

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুজুল

উপরে বর্ণিত আয়াতে মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যের কথা রয়েছে। যে অতিরেকের সাথে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, সে-ই সবচেয়ে বড়ো মুত্তাকি।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন দেখলেন, এক হাবশি ভৃত্যকে তপ্ত বালিতে রেখে অগ্নিগরম পাথর রাখা হচ্ছে তার শরীরে। ভৃত্যের ইহুদি মালিক বলতে লাগলো, তোমার নবির উপর থেকে বিশ্বাস প্রত্যাহর করো, নয়তো এভাবেই নিপীড়িত হতে থাকবে। কিন্তু ওই ভৃত্যের মুখ হতে শুধু أَحَدٌ أَحَدٌ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) শব্দ বেরুতে থাকে। ভৃত্য বলে, তুমি আমার জীবনও কেড়ে নিতে পারো, তবু আমি আমার প্রিয় রাসূলের প্রতি আমার বিশ্বাস ছাড়তে পারবো না। আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতে চাইলেন, লোকটা কে? বলা হলো, সে হাবশি ভৃত্য বেলাল। সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তার মালিক তাকে এভাবে অবিরাম নির্যাতন করতে থাকে। উত্তপ্ত পাথর চাপা দিয়ে বলে, "মুহাম্মদ ও তার খোদাকে ছেড়ে দাও।" কিন্তু লোকটা এতোই উদ্দীপিত ঈমানের অধিকারী যে, জীবন গেলেও তার ঈমানের নেশা কাটে না। হযরত বেলালের এই ঈমানদীপ্ত অবস্থা দেখে আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতিজ্ঞা করলেন, তাকে এই ইহুদি মালিকের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার এই

ircWGd-gnvejv nvme Avj-nvwmg

প্রতিজ্ঞার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, "তোমার এই কাজে আমাকেও অংশী করো।" আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "আপনি আমাদের আকা (মালিক); আমাকে অনুমতি দিন, আমি একাই এই অর্থ পরিশোধ করবো।" অতঃপর দরকষাকষির পর হযরত বেলালের মুক্তি মেলে। এরপর কুরআন মাজিদের উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেখানে আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে أَتْقَى তথা সবচেয়ে বড়ো মুত্তাকির হবার সনদ প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ
ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

–কোনো বান্দার অনুগ্রহের বিনিময়ে সে অনুগ্রহ করে না; বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অনুগ্রহ করে। নিশ্চিতই সে সন্তুষ্ট হবে।[৩৯]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সৌভাগ্য কতো! স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিষ্ঠার সনদ এসেছে। তিনি পূর্বের কোনো অনুগ্রহের পরিবর্তে এমনটা করেন নি, শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই ছিলো তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এটা জিহাদ বিল-মালের প্রায়োগিক চিত্র। এটা ইতিহাসের পুস্তকে বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত আছে। এ ধরনের কিছু ঘটনা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারেও বর্ণিত আছে। হযরত আলী ও ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একনাগাড়ে তিন দিন রোজা রেখেছিলেন- দরিদ্র, এতিম ও বন্দিকে আহার করিয়ে। ইফতার হিসেবে তাদের শুধু পানিই ছিলো। সাহাবিদের জীবন এমনই ছিলো।

সিদ্দিকি উৎসর্জনের ঈমানদীপ্ত ঘটনা

প্রসঙ্গক্রমে এখানে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার আলোচনা এসে যায়। তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবিকে অর্থ-সম্পদ প্রদান করার নির্দেশ দেন। সবাই নিজের সাধ্যমতো উপস্থিত করেন।

৩৯. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:১৯-২১।

সে-সময় হযরত ওমর ফারুকের কাছে প্রচুর সম্পদ ছিলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আবু বাকার সবসময় বিজয়ী থাকেন। এবার তিনি তার অর্ধেক সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত করে মনে মনে ভাবলেন, "এবার দেখি, আবু বাকার কিভাবে জেতে।"

ওমরকে প্রশ্ন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ يَا عُمَرُ؟

–হে ওমর, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?

ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "অর্ধেক সম্পদ পরিবারের জন্য রেখে এসেছি, বাকি অর্ধেক উপস্থিত করলাম।"

ততক্ষণে আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে পৌছালেন। তিনি তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟

–হে আবু বাকার, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?

আবু বাকারের উত্তর এ-রকম–

أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَه

–আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে রেখে এসেছি।[৪০]

হযরত আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্পদ পরিমাণে কম, কিন্তু মানে তা অতুল্য।

আবু দাউদ, তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম সুয়ুতি-সহ সব হাদিসের ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, জিবরিল আলাইহিস্ সালাম এসে বললেন,

–হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে আপনার প্রভু পাঠিয়েছেন এবং আপনার মাধ্যমে আবু বাকারকে সালাম দিতে বলেছেন।

৪০. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি আবী বকর, পৃ. ৫৫৬।

vcwWGd-gnyeqv` nvme Avj-nvwmg

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাম ও শুভসংবাদ আবু বাকারের কাছে পৌছে দেন। মাওলার সালাম ও সুসংবাদ মানুষের মনে কী অনুভূতি ও ভাবান্তর সৃষ্টি করে, তা কেবল সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যে ওই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

–হে আবু বাকার, তোমার প্রভু তোমাকে সালাম দেন জিবরিলের মাধ্যমে।

هَلْ أَنْتَ رَاضٍ عَنْ رَبِّكَ؟

–তুমি কি তোমার প্রভুর উপর তুষ্ট? অর্থাৎ, এই দরিদ্র অবস্থায় তুমি তোমার রবের উপর অভিমানী নয় তো?

আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উচ্ছ্বসিত আবেগাপ্লুত হতে উত্তর করলেন,

أَنَا عَنْ رَبِّيْ رَاضٍ: আমি আমার প্রভুর উপর সন্তুষ্ট।

أَنَا عَنْ رَبِّيْ رَاضٍ: আমি আমার প্রভুর উপর সন্তুষ্ট।

أَنَا عَنْ رَبِّيْ رَاضٍ: আমি আমার প্রভুর উপর সন্তুষ্ট।[৪১]

এখানে এটুকু স্পষ্ট যে, বান্দা যখন প্রভুর তুষ্টি কামনায় উন্মুখ থাকে, তখন সে স্রষ্টার নিমিত্ত সব কিছু নির্দ্বিধায় বিলিয়ে দিতে পারে।

উত্তরসূরিদের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর সুসংবাদ

আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে পার্থিব ও অপার্থিব সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ এখনো উন্মুক্ত। এই পথ রুদ্ধ হয়ে যায় নি; আল্লাহর তাওফিক হলে এখনো আমরা তার রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে ভাগ্যবান হতে পারি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবিদের সমাবেশে ইরশাদ করেন, "হে আমার সাহাবিগণ, আমার রাত-দিন ও দৈনন্দিন পরিস্থিতি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট। আমার জীবন-পদ্ধতি দেখে তোমরা ঈমান এনেছো এবং এটার জন্য তোমরা জীবন-উৎসর্জনে প্রস্তুত আছো। যারা তোমাদের পরে

৪১. তিরমিযী : আস্ সুনান

আসবে; তারা না দেখে আমাকে বিশ্বাস করবে, এবং আমার ধর্মপ্রচারে তারা অক্লান্ত পরিশ্রমের ঝুঁকি নেবে, সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেবে, তারা কতোই না ভাগ্যবান! তারা শুধু বই-পুস্তকে পড়ে আমার জন্য জিহাদ করবে এবং এতে তারা উপযুক্ত বিনিময় পাবে।"

বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, এ কালে মানুষ ক্ষুদ্র শস্য পরিমাণ ব্যয় করবে, কিন্তু উহুদের পাহাড় পরিমাণ তাদের বিনিময় হবে।

জুবাইদার মহল

না দেখে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং সম্পদ বিসর্জনকারীদের বিনিময়ের মাপকাঠি কী? এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা ইতিহাসের পুস্তকে পাওয়া যায়। এক দিন খলিফা হারুন রশিদ ও তার স্ত্রী জুবাইদা দাজলা নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন। তারা দেখলেন, সে-সময়ের বেহলুল দানা নামের এক আল্লাহওয়ালা বালি দিয়ে কুটিরের ঘর বানাচ্ছিলেন। জুবাইদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"বেহলুল, এ তুমি কী করছো?"
লোকটা বললেন, "জান্নাতে ঘর বানাচ্ছি।"
জুবাইদা বললেন, "একটি ঘরের মূল কতো?"
লোকটা বললেন, "দশ দিরহাম।"
জুবাইদা বললেন, "আমাকেও একটা দাও।"

জুবাইদা তাকে দশটি দিরহাম দিলেন। দিরহামগুলো তিনি নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং ঘরটি লাথি মেরে ভেঙে দিলেন। এরপর বললেন, "যাও, তোমার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মিত হয়ে গেছে।" এ অবস্থা দেখে খলিফা হারুন রশিদ স্ত্রীর প্রতি বিদ্রুপ করে বললেন, "এভাবে বুঝি জান্নাতে ঘর পাওয়া যায়?" এ অর্থ তুমি কোনো অসহায়কে দিলে তার কাজে আসতো; এখন তোমার এই অর্থ বিনষ্ট হলো।"

ওই রাতে হারুন রশিদ স্বপ্নে জান্নাতের এক শোভনীয় প্রাসাদ দেখতে পান। জান্নাতের ওই বিশাল প্রাসাদের দুয়ারে দেখলেন জুবাইদা খাতুনের নাম লেখা। তিনি ভেতরে যেতে চাইলে ফেরেশতারা তাকে বাধা দেন। তাকে বলা হলো, "এটা আপনার স্ত্রীর মহল; আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।" ততক্ষণে তার চোখ খুলে গেলো। ভোরে তিনি স্ত্রীকে জাগালেন এবং লোকটার কাছে যেতে উদ্যত হলেন। লোকটাকে ওভাবেই পাওয়া গেলো। খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "একটি ঘরের মূল্য কতো? আমারও একটি ঘর দরকার।"

লোকটা বললেন, "এখন একটি ঘরের মূল্য দশ হাজার দিরহাম।"

খলিফা বললেন, "কী হলো? মাত্র এক দিনের ব্যবধানে মূল্য এতোটা বেড়ে গেলো কী করে?"

লোকটা বলতে লাগলেন, "কারণ গতকালের ক্রেতা না দেখে কিনেছিলেন, কিন্তু আজকের ক্রেতা দেখেই কিনতে এসেছেন, তাই দাম বেড়ে গেলো।"

না দেখে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের এতো বড়ো বিনিময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাপাচারপ্রবণ উম্মতের সান্ত্বনার নিমিত্ত এই সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যারা না দেখে আল্লাহর নির্দেশ-পালনে এভাবে সম্পদ বিলিয়ে দেবে, তাদের অনুরূপ অবস্থা হবে।

সম্পদের জিহাদই প্রকৃত তাকওয়া

আল্লাহর পথে সম্পদ-বিসর্জনকারীদের ফজিলত ও মর্যাদা এখনো অক্ষুণ্ন। তবে শর্ত হচ্ছে নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে করা। পার্থিব মোহের উপর আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য পেলে মানুষ সম্পদ-ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করে না। এটাই جِهَادٌ بِالْمَالِ (সম্পদের জিহাদ) এবং এটাই প্রকৃত তাকওয়া।

মানবপ্রকৃতির তারতম্যানুসারে চেষ্টার তারতম্য ঘটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

–নিঃসন্দেহে তোমাদের চেষ্টা বড়ো বিচিত্র রকমের।[৪২]

হে লোকসকল! তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাঝে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে ভালো আবার অনেকে মন্দ প্রচেষ্টায় মগ্ন আছে। কিন্তু তাদের চেষ্টাই সফল হতে পারে, যারা অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

–অতঃপর যারা সম্পদ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, (আল্লাহকে) ভয় করে এবং সত্যের সত্যায়ন করে।[৪৩]

৪২. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:৪।

কুরআনের শিক্ষা আমাদের মাঝে একটি দর্শন জাগাতে চায় আর তা হলো, ইসলামের সাথে সম্বন্ধ ও আন্তরিকতার যতোই দাবি আমরা করি না কেন, যতক্ষণ এর বাস্তব প্রয়োগ থাকবে না, উৎসর্গ ও বিসর্জনের পথ অবলম্বন করবো না, ততক্ষণ তা প্রতারণা ও কপটতা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহর পথে সম্পদ-বিসর্জনের পথ পরিহার করে যারা নিঃশেষিত প্রচেষ্টায় শুধু সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণে উন্মত্ত থাকে, তারা প্রকৃত অর্থে ধর্মের শিক্ষাকেই অবজ্ঞা করে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞

–যারা কার্পণ্য করে, আল্লাহর সৃষ্টি হতে বিমুখ থাকে, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি (আমার প্রতিশ্রুতি মতে) তাদের জন্য জটিলতা ও দুঃসাধ্যতার উপকরণ সরবরাহ করি।[৪৪]

মোটকথা, উৎসর্গের কথা বাদ দিয়ে তাকওয়া ও সত্যতার নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব। সম্পদকে যারা আটকে রাখে, তারা ধর্মের শিক্ষাকে অস্বীকার করে। সম্পদ-বিসর্জনকারী ধর্মের সত্যায়নকারী; ব্যয়কুণ্ঠ ও কৃপণ ব্যক্তি ধর্মের অবজ্ঞাকারী। সে যতোই ইবাদত করুক না কেন, তার বিনিময় শূন্য।

جهاد بالمال তথা সম্পদের জিহাদের ধারণা যেভাবে কুরআন মাজিদে চিত্রিত হয়েছে, তার সারমর্ম হলো- দুঃস্থ মানবতার দুঃখ দূরীকরণ এবং দুর্গতদের সমস্যা-সমাধানে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ جَارُه جَائِعٌ

–সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যার প্রতিবেশি অভুক্ত থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য মতে, সে ব্যক্তি কখনো মু'মিন হতে পারে না, যে তৃপ্তিসহকারে আহার করে; অথচ তার আশেপাশে এমন মানুষ রয়েছে, যারা এক বেলার খাবার পায় না।

---

[৪৩]. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:৫-৬।
[৪৪]. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:৮-১০।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বের পৃষ্ঠাসমূহে এ বিষয়টা আলোচিত হয়েছে যে, সম্পদের জিহাদ ও তাকওয়া একে অপরের পরিপূরক। একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সাথে সাথে এ কথাও রয়েছে যে, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা ধর্মের সত্যায়ন এবং কুণ্ঠিত থাকা ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। এই পর্বে আমরা এই ধারণাকে আরো বিস্তৃতিসহকারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

মুসলমানিত্বের তিনটি অবিচ্ছেদ্য শর্ত

ঈমানের সুউচ্চ প্রাসাদ যে ভিত্তিসমূহের উপর নির্মীত কুরআন মাজিদে তা সংক্ষেপে এভাবে বিবৃত হয়েছে–

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

–যারা অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজক সরবরাহ করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।[৪৫]

উক্ত আয়াতে মুত্তাকিদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে الإيمان بالغيب (অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন) ও إقامة الصلوة (নামায কায়েম) দুটি মৌলিক শর্ত। অদৃশ্যজগতের প্রতি বিশ্বাস না করে কেউ মুসলিম হতে পারে না। ঈমানের ভিত্তিই হলো অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। ঈমানের জন্য অপরিহার্য অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম الإيمان بالغيب। এটার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো নামায। এ দুটোই ঈমানের শর্ত। এ দুটোকে বাদ দিয়ে মুসলিম হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হওয়ার জন্য এ দুটোই যথেষ্ট।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাকওয়ার। এই প্রশ্ন অনুধাবনের জন্য আরেকটা বিষয় বোঝা দরকার। তা হলো, মুসলিম হওয়া আর মুসলিম থাকার মাঝে কী পার্থক্য? মুসলিম হওয়ার জন্য ঈমান ও নামায অত্যাবশ্যকীয় শর্ত; তবে মুসলিম থাকার জন্য তাকওয়া ও খোদাভীতির বিকল্প নেই। অন্য ভাষায়, ইসলামের সম্পদ ও ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তৃতীয় শর্ত হচ্ছে ومما رزقناهم ينفقون- তথা আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা। কেউ যদি প্রথম দুটো শর্ত

---

[৪৫]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৩।

তথা ঈমান ও নামায পূরণ করে, তাহলে তার মুসলমানিত্বকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তৃতীয় শর্ত তথা আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, إنفاق في الرزق তথা ব্যয় করার সাথে جهاد بالمال তথা সম্পদের জিহাদ ও ঈমানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মোট কথা, ঈমানের মতো মহার্ঘ সম্পদ যা প্রথম দুটো শর্তের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে।

গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, তৃতীয় শর্তের সাহায্যে প্রথম দুটো শর্ত দৃঢ় হয়, এবং এটাই ওই দুটোকে প্রমাণিত করে। আল্লাহর নির্দেশনা মতে আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করাই তাকওয়া অর্জনের উপায়। তাকওয়ার এ ধাপ অতিক্রম করলেই হেদায়তের গন্তব্য সুগম হয়। কুরআন মাজিদ তখনই মুত্তাকিগণের সামনে হেদায়তের পথ খুলে দেয়, যখন সম্পদ-ব্যয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়। কুরআন মাজিদের যেসব জায়গায় তাকওয়ার কথা এসেছে, সে-সব জায়গায় সম্পদ-বিসর্জনের শর্তও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। এ বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়সমূহে বিবৃত হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে সে-ই মুত্তাকি যে তার পথে সম্পদ ব্যয় করতে পারে।

সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় সম্পদ-ব্যয়

কুরআন মাজিদে মুত্তাকির সংজ্ঞায়নে এক দিকে তিনটি শর্ত এবং অপর দিকে এভাবে বলা হয়েছে,

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ

–প্রতিযোগিতা করো জান্নাতের দিকে, যার পরিধি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত; এটা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুতকৃত, যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সম্পদ ব্যয় করে।[৪৬]

পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, মুত্তাকিদের জন্য এমন জান্নাত নির্ধারিত করা হয়েছে, যা আসমান-জমিন ও তার সমুদয় বিষয়সমূহকে বেষ্টন করে আছে। সামনে এগিয়ে উক্ত চিত্রকে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে যে, জান্নাতের এই বিশাল নেয়ামত কাদের জন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে,

[৪৬]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৩-১৩৪।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ: যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে- সাধ্যমতো। সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর সম্পদ না থাকলেও সাধ্যমতো ব্যয় করে। সর্বাবস্থায় তারা সম্পদ-ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করে না। এটা সাহাবা কেরামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীবাসীর কাছে এভাবে বিকশিত করা হয়েছে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

–তারা কঠিনতম মুহূর্তেও অপরকে প্রাধান্য দেয়।[৪৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গীদের তাকওয়ার অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা অভুক্ত থাকে, নিজের জন্য সমস্ত কষ্ট-পরিশ্রম-জটিলতা সহজে মেনে নেন; তবু অপরকে প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত হন না। এতে বোঝা যায়, সম্পদ ব্যয় করার জন্য প্রাচুর্যের প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় অন্তরের। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ভালোবাসে, তারা সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, প্রাচুর্য-নিঃস্বতা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আর্তমানবতার জন্য সম্পদ বিলিয়ে দেয়- অনায়াসে।

লক্ষ্য করুন

উপরের বর্ণিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে তাকওয়ার চিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এখানে কুরআনের আরেকটি আয়াতের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যেখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ-বিসর্জন ও তাকওয়াকে একে অপরের পরিপূরক বলেছেন। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার বিষয়টা বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার পথে অর্থ-ব্যয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

–যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) অর্থ-ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং সত্যতার সত্যায়ন করে, আমি তাদের জন্য সহজতার উপকরণ সরবরাহ করি।[৪৮]

[৪৭]. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯:৯।

কুরআনের ভাষ্য মতে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ-ব্যয় করে তাকওয়া ও কল্যাণের পুঁজি গঠন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সহজতার পথ উন্মুক্ত করে দেন। তাকওয়ার এ বৈশিষ্ট্য অর্জনে সম্পদশালী ও সম্পদহীনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি এই অভিযোগ করে যে, সম্পদশালী প্রাচুর্যের কারণে সম্পদ-ব্যয়ে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে, আমাদের তো সেই সুযোগ নেই, তাহলে তার এই অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে কারো কাছে যদি দুই টাকাও থাকে, তাহলে সে এক টাকা ব্যয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। অনেক সময় এমনও হতে পারে, তার এই এক টাকা অন্তরের বিশুদ্ধির কারণে অজস্র অর্থ বিলিয়ে দেওয়া হতে উত্তম।

ইতঃপূর্বে একটি হাদিসের আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ ক্ষুদ্র শস্য পরিমাণ ব্যয় করবে, অথচ সে উহুদের পাহাড়-সমতুল্য সাওয়াবের অধিকারী হবে। এই হাদিসে না দেখে ব্যয় করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। অপর দিকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বল্পপরিমাণ ব্যয় করে আর আল্লাহ মানুষের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত– তার মর্যাদা সম্পদশালীর নিঃসীম ব্যয় হতে উত্তম। তিনি মানুষের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। মানুষ কী উদ্দেশ্যে দান করে, তা তার অগোচরে নয়। তার দূরদর্শন পরিমাণের দিকে নয়, নিয়তের দিকে নিবদ্ধ।

এ সংক্রান্ত হযরত সিদ্দিক আকবরের ব্যাপারে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথা স্পষ্ট ছিলো যে, তার সম্পদ হযরত ওমর ফারুকের সম্পদের তুলনায় কম ছিলো; কিন্তু আল্লাহর দরবারে তা যেভাবে গৃহীত হলো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালামের যে সৌভাগ্য লাভ করলেন, তা ওমরের ভাগ্যে জুটলো না। তবে উভয়ের দান যে গৃহীত হয়েছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই। এটার কারণ হলো, পরিমাণের দিক থেকে সম্পদ যদিও কম, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো- সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। এতো বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ সম্পদের পরিমাণের দিকে তাকান না, ইচ্ছা ও নিয়তের দিকে তাকান। বুখারী শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

[৪৮]. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:৫-৭।

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ.

–নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও নিয়তের দিকে তাকান।[৪৯]

এই হাদিসের মর্মবাণী হলো- হে লোকসকল, তোমরা তাকওয়া ও ইবাদতের যে পসরা সাজিয়ে আছো, ভালো ও কল্যাণের যে মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে আছো, তা তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি তোমাদের গঠন, সম্পদ ও বাহ্যিক কর্মের দিকে নয়; তার কাছে তোমাদের অন্তরের নিয়ত গ্রহণীয়। তাই কখনো-সখনো বিত্তবানের অজস্র দান গৃহীত হয় না; পক্ষান্তরে নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে কোনো দরিদ্রের স্বল্প দানও আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়। আমাদের কাছে বেশ-কমের যে মাপকাঠি রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর জন্য তোমরা যা কুরবানি কর, তার মাংস কিংবা রক্ত তার কাছে পৌঁছায় না; তিনি তাকওয়াই গ্রহণ করে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

–তার কাছে তোমাদের ইখলাস ও নিষ্ঠা পৌঁছে থাকে।[৫০]

রাসূল ﷺ এর সামনে এক সাহাবির ঘটনা

তাকওয়া, ইখলাস ও নিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মুসলিম শরিফে ঘটনাটা এসেছে।

একদিন এক সাহাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হন। তার হাতে একটি স্বর্ণালঙ্কার ছিলো। তিনি এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত করে বলেন, "এটা আমি আপনাকে এ জন্য দিচ্ছি যে, আপনি এটা আমার পক্ষ থেকে সাদকা করে দেবেন।" লোকটা আরো বললেন, "আমার কাছে শুধু এটাই ছিলো সম্পদ হিসেবে; আর আমি তার পুরোটাই সাদকা করছি।" হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটা আবার বললেন। তখনো তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটা তৃতীয় বার একই কথা বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার কাছে তোমার সাদকার প্রয়োজন নেই।"

[৪৯]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:২৮৫।
[৫০]. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২:৩৭।

হাদিসবিশারদগণ এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। লোকটার এই সাদকা কেন গ্রহণ করা হলো না? অথচ হযরত আবু বাকারের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনায় তিনি সচ্ছন্দে তা গ্রহণ করেন। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, আবু বাকারের দান ছিলো নিঃসংকোচ। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্ন করলেন, "তুমি ঘরে কী রেখে এসেছো?" উত্তরে তিনি এ কথা বলেন নি যে, আমি ঘরে কিছুই রেখে আসি নি; সবকিছু নিয়ে এসেছি। বরং তার উত্তর ছিলো, "ঘরে আল্লাহ ও তার রাসূলকে রেখে এসেছি।" এটা তার আন্তরিক উদারতার প্রকাশ। ঘরে যদিও কিছু ছিলো না, তবু এতে তার মনে কোনো দুঃখবোধ ছিলো না। কিন্তু হাদিসে বর্ণিত সাহাবির ঘটনা ভিন্ন ছিলো। তার অন্তরে সম্পদ-ব্যয়ের উন্মুখতা ছিলো বটে, কিন্তু অন্তরের ঔদার্য ছিলো না। তাই তো লোকটা বারবার বলছিলেন, ঘরে আর কিছু নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লোকটার অন্তরের বৈক্লব্য স্পষ্ট ছিলো বলে তা গ্রহণ করেন নি।

এ কারণেই সূক্ষ্ম দার্শনিক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

> –সর্বোত্তম সাদকা হলো- যা নিজের জন্য কিছু রেখে করা হয়। আর সেসব মানুষকে দিয়ে সাদকা শুরু করো, যারা তোমার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।[৫১]

সাদকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, নিজের জন্য কিছু রেখে সাদকা করা, যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে আবার অপরের সাদকার মুখাপেক্ষী হতে না হয়। তাই সাদকার সময় আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এরূপ সাদকার কী মূল্য, যা করার পর নিজেকে আবার সাদকার মুখাপেক্ষী হতে হয়?! তাই সাদকা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সাদকা করার সময় নিজের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখো, আর যেসব আত্মীয়ের প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে, তাদেরকে আগে দাও। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, নিঃস্ব অথচ সম্মানিত ব্যক্তি, দুঃস্থ সঙ্গীদের কথা আগে ভাবতে হবে, যাদের খাওয়া-পরার কিছুই নেই।

[৫১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২:৫১৩।

আফসোস সেসব ধনিকশ্রেণির জন্য, যারা নিজেদের বিত্ত-বৈভবের প্রসিদ্ধি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে; এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়।

ফরয ছেড়ে নফলের পিছু ছোটা বোকামি

যদি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাও, তবে তার কাছেই তাওফিক কামনা করো এবং বিন্যাস ও ধারাবাহিকতাও তার কাছ থেকে গ্রহণ করো। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকেই প্রথমে সাদকা দিতে বলেছেন। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী- সাদকা দেওয়ার সময় এই ধারাক্রম মেনে চলা উচিত। ফরয ছেড়ে নফলের পিছু ছোটার বিড়ম্বনা যেন না হয়। গাওসুল আজম বলেন, 'যে ব্যক্তি ফরয ছেড়ে নফলের পিছু ছোটে, তার মতো নির্বোধ আর নেই।' প্রাপককে তার অধিকার না দিয়ে অপরকে দান-সাদকা প্রভৃতি করা অধিকার-হরণের সমার্থক। আত্মীয়তার সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে অধিকার পৌঁছিয়ে দাও; এভাবে ক্রমাধারা অব্যাহত রেখো। অন্যথায় সবকিছু লোকদেখানো বৈ নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাদকা দেওয়ার সময় নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছু রেখে দেওয়া উচিত। এমন যেন না হয়, দাতা সবকিছু উজাড় করে দিয়ে পরে অপরের মুখাপেক্ষী হয়। وَلَاتَغَالُوْا وَلَاكَفَى- এই মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের জন্য কিছু রেখে দিতে হবে। এটা মানুষকে মুখাপেক্ষিতার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

> –তারা কী ব্যয় করবে, সে বিষয়ে তোমার কাছে জানতে চায়; বলো, যা অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে ব্যয় করো।[৫২]

সমস্ত উম্মতের জন্য এটাই নির্দেশ যে, তারা অবশিষ্টাংশ হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এর ব্যতিক্রম। যাদের অন্তর মহান, যারা আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত, যারা আল্লাহর পথে সবটুকু বিলিয়ে দিতে কোনো কিছুর পরওয়া করে না, তারা নিঃশেষে লুটিয়ে দিতে পারে। যেমন হযরত আবু

[৫২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২১৯।

বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সবকিছু বিলিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যারা সংশয়াপন্ন, তাদের দান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

এক আল্লাহপ্রেমী দরবেশের ঘটনা

কিছু কিছু কিতাবে এক আল্লাহপ্রেমিক দরবেশের ঘটনা পাওয়া যায়। পার্থিব প্রাচুর্যে যার প্রচণ্ড অনীহা ছিলো। লোকটার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নি; তবে ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। ঘটনা হলো- লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ নিয়ে তার একটি জাহাজ অন্য দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এক দিন এক ব্যক্তি এসে জানালো যে, "আপনার জাহাজ ডুবে গেছে।" খবরটা শোনামাত্রই তিনি মুরাকাবায় বসে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে "আল-হামদু লিল্লাহ" বলে উঠলেন। কিছুক্ষণ না যেতেই আরেক ব্যক্তি এসে বললো, "প্রথম সংবাদ ভুল ছিল; আপনার জাহাজ নিরাপদে আছে। এই সংবাদও পাওয়া গেছে যে, আপনার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।" এটা শুনে তিনি একটুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে আবার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে উঠলেন। সামনে উপবিষ্ট কেউ একজন বললো, "এটা বুঝতে পারলাম না যে, জাহাজডুবির সংবাদেও আপনি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললেন, আবার নিরাপদে থাকা এবং বাণিজ্য লাভজনক হবার খবরেও আপনি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললেন; এর রহস্য কী?" দরবেশ বললেন, "জাহাজডুবির খবরে আমি নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, নিজের ভেতরে কোনো মলিনতা দেখতে পাই নি; আবার জাহাজের নিরাপত্তার খবরে কিছুটা আনন্দিত হলাম। তবে অন্তর সবসময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন ছিল। তাই উভয় অবস্থায় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এই আসনে অধিষ্ঠিত হই যে, লাভ-ক্ষতি দুটোই আমার জন্য সমান। সবসময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে।"

হাত কাজে ব্যস্ত, অন্তর বন্ধুর স্মরণে মগ্ন

যে-সব বান্দা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে, তাদের ব্যাপারে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ
وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ

–সে-সব মানুষ, যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য আল্লাহর যিক্‌র, নামায ও যাকাত হতে বিরত রাখতে পারে না।[৫৩]

আল্লাহর এ-সব বান্দা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বটে, লাভ-ক্ষতি দুটোতেই তারা বিচলিত হন না; তারা সদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকেন। ব্যবসায়ের লোকসান তাদেরকে এটুকু অস্থির করতে পারে না। পাঞ্জাবির এক লোক-কথা প্রচলিত আছে, ہتھ کار ول، دل یار ول আল্লাহর স্মরণে প্রমত্ত মানুষের এরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। তাদের হৃদ্যতার অবস্থা এই যে, কোনো বস্তুর মালিক হওয়া না হওয়া তাদের জন্য সমান।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের ব্যাপারে বলেন,

وَمَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكٰوةُ مَالٍ

আমার উপর কখনো সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হয় নি।

অর্থাৎ গোটা জীবনে যাকাত ওয়াজিব হবার সুযোগ আসে নি। যারা উদার, সর্বদাই দানশীল তাদের জীবনে যাকাত ওয়াজিব হবার সুযোগ আসে না। চিত্তপ্রাচুর্যের এই অবস্থান সবার ভাগ্যে জোটে না। তারা আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পন্থায় সবকিছু আল্লাহর পথে বিলীন করে দিতে কার্পণ্য করেন না। তারা বরং এতে তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে এই আশঙ্কা চেপে বসে যে, আজকে সবকিছু আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলে আগামিকাল কিছুই থাকবে না, তবে তাদের উচিত সাধ্যমতো ব্যয় করা। নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরে যা অবশিষ্ট থাকে,তা থেকে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। মোট কথা, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করার কোনো সীমারেখা নেই। এটা মানুষের অন্তরের উপর নির্ভর করে।

কুরআন মাজিদের মর্ম ও মানুষের ভুল ধারণা

কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করে, সে যেন নিজের কর্মের মাধ্যমে ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত করে; অপর দিকে যারা ব্যয়কুণ্ঠ, আল্লাহর পথে সম্পদ-ব্যয়ে কার্পণ্য করে, অসহায়-দরিদ্রের প্রতি মনোযোগী নয়, তারা ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[৫৩]. আল কুরআন : সূরা নূর, ২৪:৩৭।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾

–যারা কৃপণতা দেখায়, (অসহায়ের প্রতি) অমনোযোগী এবং সত্যতার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[৫৪]

উদ্ধৃত আয়াতে بَخِلَ (কৃপণতা) ও اِسْتَغْنَى (অবহেলা/ অমনোযোগিতা/ উপেক্ষা) উভয় শব্দ এসেছে। প্রথমত- তারা কৃপণতার দরুন দুঃস্থ ও অসহায়ের জন্য সম্পদ ব্যয় করে না। দ্বিতীয়ত- তারা নিঃস্বদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর থাকে। اِسْتَغْنَى শব্দের ব্যবহারে মানসিক বৃত্তির এই ধারণার বিকাশ ঘটেছে যে, এক দিকে দরিদ্রদের জন্য ব্যয় না করার কথা; অপর দিকে এ কথা বলা হয়েছে, কোনো মানুষ না খেয়ে মারা গেলে তাদের কিছুই যায় আসে না। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ভোগ করছে। অধিকন্তু এসব মানুষ সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই তাদের প্রতি। আমাদের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফল তারা কেন ভোগ করবে? এ ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা মনে করে যে, কেউ যদি সম্পদশালী হয়, তবে এটা তার যোগ্যতার ফসল; কেউ অভুক্ত থাকলে, তা তার ভাগ্য। এটাই যদি আল্লাহর নিয়ম হয়ে থাকে, তবে আমরা তার জন্য সম্পদ অপচয় করবো কোন যুক্তিতে?

এই নিঃস্পৃহতা ও উদাসীনতা মূলত সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদের ধারণা থেকে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় ন্যায়, নিষ্ঠা ও বিধানকে অকার্যকর করে তোলে। এটা মানুষের সামনে মহা দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে, যা সমাজব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। এতে মানুষ না খেয়ে মারা পড়ে, অসৎ ও নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হয়, তবু কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। অবশেষে ধীরে ধীরে দরিদ্রদের সামাজিক ভাঙ্গন তরান্বিত হয়।

কুরআন মাজিদের সুরা মাউনে এই চিত্রের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। প্রথমেই প্রশ্নের আলোকে বলা হয়েছে,

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾

–তাদের ব্যাপারে কী মনে কর, যারা ধর্মকে অস্বীকার করে?

[৫৪]. আল কুরআন : সূরা লাইল, ৯২:৮-৯।

পরবর্তী আয়াতে এর উত্তর রয়েছে। যারা ইসলামকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোজা হজ্জ ও নির্ধারিত জাকাতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে অস্বীকার করে। যারা শুধু নামায নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সমাজের অনাথ ও অসহায়ের অন্তরে যারা কষ্ট দেয়, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾

–যারা এতিমকে ধাক্কা দেয়।

এখানে ধাক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্য শুধু আঘাত করে ফেলে দেওয়া নয়। বরং এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাকে (Status) অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নিম্নস্তরের মানবতার প্রতি উদাসীন থাকে। কুরআন মাজিদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, যারা সামাজিক বৈষম্য-সৃষ্টির পক্ষে, শুধু আর্থিক সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নেয় না, বরং দম্ভের কারণে তাদের সঙ্গদান কিংবা করমর্দনে চরম অনীহা প্রকাশ করে; অথচ তারা ইবাদত প্রভৃতি করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে। এসব মানুষের ইবাদত-বন্দেগি তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। এসব মিথ্যে ধারণাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরোপুরি নাকচ করেছেন এবং সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করেন إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ: নিশ্চয় তোমাদের মাঝে যারা মুত্তাকি, তারাই অধিকতর সম্মানের উপযুক্ত।

এখানে স্পষ্ট যে, তাকওয়াই সম্মানের ভিত্তি। তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও অহঙ্কারের অবকাশ থাকে না। কেউ যদি দাম্ভিক মানসিকতা নিয়ে তাকওয়ার দাবি করে, তাহলে তার দাবি ভ্রান্ত হবে; তাকওয়ার পরশও তার মাঝে থাকতে পারে না।

ইসলামের আলোকে ধর্মের সত্যায়নের মর্মবাণী হচ্ছে, ধনী-দরিদ্র সবার সাথে সমান সম্পর্ক বজায় রাখা; শুধু আর্থিক কারণে বৈষম্য সৃষ্টি না করা। দুঃস্থ ও নিঃস্বদের প্রয়োজন পূরণের মাঝে ধর্মের সত্যায়ন নিহিত। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে, তবে সে ধর্মের প্রতি মিথ্যারোপ করলো- সে যতোই নামায পড়ুক না কেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, কুরআন মাজিদের আলোকে ধর্মের সত্যায়নের মাপকাঠি হচ্ছে- আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং ধর্মের প্রতি মিথ্যারোপের মর্ম হলো- অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা। এই ধারণাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য সুরা মাউনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহের আলোচনা উপস্থাপন করছি–

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۝٧

–তুমি কি দেখেছো (অথবা তুমি কী মনে কর) সেই ব্যক্তিকে, যে ধর্মের প্রতি মিথ্যারোপ করে? এ সেই ব্যক্তি- যারা এতিমকে ধাক্কা দেয়; অসহায়দের নিজেও খাবার দেয় না এবং অপরকে দিতেও উৎসাহিত করে না। এ-সব নামাজিদের জন্য আক্ষেপ- যারা নামাজের ক্ষেত্রে উদাসীন এবং যারা শুধু লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে; আর কিঞ্চিৎ পরিমাণ দান করে না।[৫৫]

সুরার প্রারম্ভে প্রশ্নের ধাপে বিষয়টা উত্থাপন করতে গিয়ে বলা হয়েছে أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ। এটা এ জন্য বলা হয়েছে যেন সুরার পরবর্তী আয়াতসমূহে উপস্থাপিত বিষয়টা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সীমা

উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এখানে প্রশ্নকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এখন আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে مُصَدِّقٌ بِالدِّيْنِ (ধর্মের সত্যায়নকারী) উপাধি দেন, তাহলে তার ভাগ্য কতো বড়ো! আল্লাহ যাকে ধর্মের সত্যায়নকারী বলেন, তার সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কারো সংশয় থাকে না। এখন যাকে আল্লাহর

[৫৫]. আল কুরআন : সূরা মা'উন, ১০৭:১-৭।

পক্ষ থেকে مُكَذِّبٌ بِالدِّيْنِ (ধর্মের মিথ্যারোপকারী)-এর মতো উপাধি দেওয়া হয়, তার দুর্ভাগ্য অপরিমেয়।

উল্লিখিত সুরার প্রথম আয়াত কুরআনের পাঠক, সম্বোধিত ও ইসলাম-অবলম্বীদের জন্য এক সূক্ষ্ম সতর্কতা জাগিয়ে তুলেছে। শোনামাত্রই শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগবে, কে সেই দুর্ভাগা- যাকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মের মিথ্যারোপকারী বলেছেন? কী কী গর্হিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে? পরবর্তী আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে: যারা এতিম ও নিঃস্বদের অভাব-মোচনের চিন্তা করে না; বরং তাদেরকে নিম্নস্তরের ভেবে হিংসা করে। অনাথ ও অসহায়দের প্রতি তাদের কোনো মায় থাকে না। কুরআন মাজিদের শব্দ এ-রকম–

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣

–এ সেই ব্যক্তি- যারা এতিমকে ধাক্কা দেয়; অসহায়দের নিজেও খাবার দেয় না এবং অপরকে দিতেও উৎসাহিত করে না।[৫৬]

প্রকাশ থাকে যে, এখানে يتيم (ইয়াতীম) শব্দটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের যেসব সদস্য নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল, যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে অপরের মুখাপেক্ষী, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

দুটি পৃথক কর্মপদ্ধতি ও বিধান

কুরআন মাজিদ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, যারা নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানবতার জন্য কোনোরূপ আকর্ষণ, সহমর্মিতা, মায়া, উপকারিতা ও সহানুভূতি অনুভব করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মিথ্যারোপকারী। উপায়হীনদের জন্য কিভাবে খাবারের সরবরাহ হবে, কিভাবে তারা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে- এ ব্যাপারে ধনিকশ্রেণির কোনো মাথাব্যথা থাকে না। সমাজের দরিদ্র, অক্ষম ও প্রতিবন্ধীদের দুরবস্থায় তাদের কোনো অনুভূতি জাগে না। তারা বিলাসিতা ও উন্নত জীবন-যাপনে মগ্ন থাকে, অভাবীদের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই। মানুষের কঠিনতম মুহূর্তে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। অধিকন্তু তারা দুর্গতদের জীবিকার পদ্ধতি পরিবর্তনেও কোনোরূপ উৎসাহ দেয় না।

[৫৬]. আল কুরআন : সূরা মা'উন, ১০৭:২-৩।

উদ্ধৃত সুরা মাউনের আয়াতসমূহে দুটো সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনার পাশাপাশি দুটো কর্মপদ্ধতির আলোচনাও এসেছে। প্রথমত: তারা অভাবগ্রস্তদের আর্থিক উন্নয়নে নিজের সম্পদ ব্যয় করে না। দ্বিতীয়ত: সমাজে যারা ধনবান তাদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এতে বোঝা যাচ্ছে, শুধু নিজের সম্পদ ব্যয় করলে যথেষ্ট হবে না; বরং এতিম, নিঃস্ব, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করার পাশাপাশি অপরকেও উৎসাহিত করতে হবে। এবং এটা খুব জরুরি একটা বিষয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য-বিমোচনের লক্ষ্যে সম্মিলিত ভূমিকা রাখতে হবে।

একটা নতুন জীবন-পদ্ধতি ও চিন্তার কুরআনি শিক্ষা

এখানে কুরআন মাজিদ একটা বিশেষ জীবন-পদ্ধতি ও গবেষণার শিক্ষা দিচ্ছে। কুরআনের দর্শন মতে যে ব্যক্তি দরিদ্র ও দুর্বলদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায় না, সে ধর্মের মিথ্যারোপকারী; অনুরূপ যে ব্যক্তি বঞ্চিত মানবতার বেকারত্ব দূরীকরণে সমাজের সম্পদশালীদেরকে উৎসাহিত করে না, সেও ধর্মের মিথ্যারোপকারীর অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যে নিজে এমনটা করে না, সে অন্যকে কিভাবে প্রভাবিত করবে।

কুরআন মাজিদের অপর আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

–কী কারণে তোমাদেরকে দোজখে নিক্ষিপ্ত করা হলো?[৫৭]

তারা বলবে, প্রথমত- আমরা নামায আদায় করতাম না। দ্বিতীয়ত- অভাবগ্রস্তদের সমস্যা-সমাধানে আমাদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। এই দু প্রকারের উদাসীনতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ।

সামুদ গোত্র-প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদের বর্ণনা হতে পাওয়া যায়, তারা মান-মর্যাদা ও শান-শাওকতের অধিকারী ছিলো। তাদের ধ্বংসের এটাই একমাত্র কারণ যে, গোত্রের ধনিকশ্রেণি বিলাসিতায় প্রমত্ত থাকতো, তারা সম্পদের অযথা অপচয় করতো; অথচ সমাজে এমন কিছু মানুষ ছিলো, যারা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে ত্রস্ত থাকতো। প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ

[৫৭]. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাসির, ৭৪:৪২।

করতে গিয়ে তারা মান-সম্ভ্রমকে পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত করতো। যে সমাজে এতো বিশাল বৈষম্য ও বিভেদ বিদ্যমান, সে সমাজের বিনাশ অনিবার্য।

এটা ঘটনা যে, সমাজের মানুষ সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে উদাসীন থাকতে পারে না। যারা সমাজের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করে, তাদের টিকে থাকার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না; তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে এবং একসময় বিলীন হয়ে যায়। এ চিত্রকে স্পষ্ট করতে গিয়ে কুরআন মাজিদ ঘোষণা করছে,

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

–যখন আমি কোনো জনপদকে বিধ্বস্ত করার ইচ্ছে পোষণ করি, বিলাসপ্রিয় লোকদেরকে প্রণোদিত করি; তারা তাতে অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে; এতে তাদের শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তাদের আমি সমূলে বিনাশ করি।[৫৮]

কোনো গোত্র, সমাজ বা রাষ্ট্রে যখন এই অবস্থা পরিলক্ষিত হবে যে, সমাজের সম্পদ ও শক্তিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে- তারা যেন তৎপর প্রচেষ্টায় সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং আল্লাহর নির্দেশ-পালনে সমাজের নিঃসম্বল লোকদের আশ্রয় প্রদান করে; কিন্তু এটার পরিবর্তে তারা অবাধ্যতা ও দ্রোহিতার পথ অবলম্বন করে, তখন সুপ্ত তাকদির স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং গোটা সমাজকে ভয়ঙ্করভাবে মূলোৎপাটিত করে। তাদের এই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী শাস্তি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের এই কুরআনি দর্শন এখনো সভ্য সমাজের সামনে গবেষণার দ্বার উন্মোচিত রেখেছে। মনে রাখতে হবে, যেভাবে সমাজের বিত্তবানশ্রেণির বিনাশে গোটা সমাজ বিধ্বস্ত হয়, ঠিক সেভাবে সমাজের বিত্তশালীদের সংশোধনে সমাজ উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ করে। উচ্চ পদস্থদের সংশোধন গোটা সমাজকে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে, اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ অর্থাৎ প্রজা রাজাদের পথ অনুসরণ করে। তখন মানুষ তাদেরকে

[৫৮]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১৬।

আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। এরপর ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের যাত্রা শুরু হবে। মনে রাখা দরকার, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আমল করার ততোটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না, যতোটা প্রভাব সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রপথিকদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি, যারা আল্লাহর বান্দাদের সমস্যা-সমাধানে নিজের অবলম্বনকে বিলিয়ে দেয়।

সম্পদ এক দিকে নেয়ামত, অপর দিকে পরীক্ষার বস্তু

সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নেয়ামত এবং কঠিন পরীক্ষা ও গুরুদায়িত্বের উপকরণ। এটাকে শুধু নেয়ামত ভাবলে ভুল হবে; বরং কঠিন চ্যালেঞ্জ মনে করে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত দায়িত্ব-পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কথা ও কাজের বিরোধ কপটতার সৃষ্টি করে। যারা এক কানে শুনে অপর কানে বের করে দেয়, কেয়ামতের মাঠে তাদেরকে গর্দান চেপে প্রশ্ন করা হবে; তখন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না।

সামুদ গোত্রের উত্থান ও পতনের আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ যে দর্শন নির্ধারিত করেছে তার সারমর্ম হলো, সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নের দিকে পুরোপুরি গুরুত্ব দেওয়া হলে সমাজ জীবিত থাকে; তখন সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির দুয়ার খুলে যায়। পক্ষান্তরে সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

আর্থিক অবক্ষয়ে ধর্মানুভূতি দৃঢ় হতে পারে না

মনে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শুধু আর্থিক অবক্ষয় কি ধ্বংসের কারণ? এর উত্তর হলো, কোনো সমাজ শুধু ঈমান, চরিত্র ও ধর্মানুভূতি নিয়ে সমৃদ্ধ হয় না, যতোক্ষণ তাদের আর্থিক অবস্থার সমৃদ্ধি না ঘটে। এ দুটো বিষয় একে অপরের পরিপূরক যেন। একটা অপরটা হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আর্থিক পরিস্থিতিতে অবক্ষয় ঘটলে ধর্মানুভূতি কখনো দৃঢ় হতে পারে না- এটা ইসলামি শিক্ষার আত্মা। যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাযকে মাকরুহ বলা হয়েছে। নামাজের সময়ে যদি ক্ষুধার তীব্রতা থাকে, তাহলে আগে খেতে বলা হয়েছে, তারপর নামায। উদরজাত চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকার কথা এসেছে। পুরো সমাজব্যবস্থায় এই দর্শন প্রযোজ্য। যদি জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পথ বন্ধ থাকে, মানুষ অপরাধ-কাজে জড়িত হতে বাধ্য থাকে, ঈমানদারির পরিবর্তে বেইমানি, আমানতের পরিবর্তে খেয়ানত মানুষের অন্তরাত্মাকে পরিব্যাপ্ত করে, তাহলে নামাজের প্রতি একনিষ্ঠতা ও

ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ অকল্পনীয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ঈমান সুরক্ষিত থাকবে কী করে!

দারিদ্র্য কুফরির অনুঘটক

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَادَ الْفَقَرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا،

–দারিদ্র্য কুফরি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।[৫৯]

দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা মানুষকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রবল ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকে আবু বাকারের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সমান হতে পারে না; হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবু জর গিফারি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং অন্যান্য সাহাবিদের সমতুল্য হতে পারে না। অনেক পরিশ্রমী মানুষকে দেখা যায়- যারা ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায় কাজ করে, সড়ক বা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চবাচ্য হলে তারা পতাকা হাতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, "তোমাদের আগে খাবারের প্রয়োজন নাকি ঈমানের প্রয়োজন?" তখন তারা নির্দ্বিধায় আগে খাবারের কথা ভাববে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। নিঃস্বতা মানুষকে কুফরি পর্যন্ত উপনীত করে। কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে রোজা রাখতে বলা হলে সে বলবে, "আমি তো গোটা জীবনই রোজা রেখে যাচ্ছি।" যদি সে আর্থিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করে, তবে সেটা আশ্চর্যের কিছুই না। এটা সমাজের সম্পদশালী ও বিত্তবানদের উদাসীনতার কারণে। তাদের অবহেলা সমাজকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটা সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় ও অত্যাচারের ফলাফল, যা বঞ্চিতদের মনে ধর্মের প্রতি অনাগ্রহ, অনীহা এবং কুফ্র ও পাপাচারের বীজ রোপণ করেছে। তখন এমনও অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায়, তাদের যখন নামায পড়তে বলা হয়, তখন তারা বলে, "কোন প্রভুর নামায পড়বো, যিনি আমাদের খাবার পর্যন্ত দেন না।" (নাউজু বিল্লাহ)

---

৫৯. ক) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবুস্ সালাম।
খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১৪:১২৫।
গ) কাযায়ী : মুসনাদুশ্ শিহাব, ২:৪২৪।

এসব অসংযত কথা ও অসঙ্গত আচরণ অন্যায় ও অত্যাচারের পরিণতি, যা মনবসৃষ্ট সমাজব্যবস্থার (Man made system) কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

কুরআন মাজিদ বারবার মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে ঘোষণা করছে,

وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠

–(নিজের উপার্জিত সম্পদ হতে দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা তো দূরের কথা, বরং) তোমরা তো মিরাসের সম্পত্তি পর্যন্ত অন্যায়ভাবে গ্রহণ কর, আর সম্পদকে প্রচণ্ড ভালোবাসো।[৬০]

কুরআন মাজিদের শব্দের পরতে পরতে কী পরিমাণ সতর্কতা, অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ বিধৃত হয়েছে- একটু লক্ষ্য করুন। আল্লাহ এটা কখনোই সহ্য করেন না, যখন মানুষ أَكْلًا لَّمًّا তথা মিরাসের সম্পত্তি পর্যন্ত ভোগ করতে তটস্থ থাকে। আবার وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا তথা সম্পদকে এভাবে ভালোবাসা যে, ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের প্রতি ভুলেও লক্ষ্য করা হয় না।

সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি

সম্পদ আহরণ করে যারা একের পর এক জমা করতে থাকে, তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে,

ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝٣ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ ۝٤

–যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং গুণে গুণে রাখে; তারা মনে করে, সম্পদ তাদের চিরসঙ্গী, কখনো না! তারা নির্ঘাত নিক্ষিপ্ত হতে হুতামায় (জাহান্নামের একটি স্তর)। তুমি কি জানো? হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।[৬১]

সম্পদ যারা জমা করে রাখে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা যদি ভেবে থাকে যে, এসব সম্পদ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবে, তাহলে

[৬০]. আল কুরআন : সূরা ফাজর, ৮৯:১৯।
[৬১]. আল কুরআন : সূরা হুমাযাহ, ১০৪:২-৪।

এটা মারাত্মক ভুল হবে। كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ কখনো না! তারা নির্ঘাত নিক্ষিপ্ত হতে হুতামায়। সাপ হয়ে এসব সম্পদ তাদেরকে দংশন করবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

–যারা সোনা ও রুপা একত্র করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বিভীষিকাময় আজাবের সংবাদ শুনিয়ে দাও।[৬২]

কঠিন ভাষায় এই সতর্কতা ও ভয়ানক আজাবের ধমক সেসব ব্যক্তির জন্য যারা এতিম, মিসকিন ও দরিদ্রের প্রতি উদাসীন থাকে এবং তাদের আর্থিক অনটনে কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তারা যতোই নামায আর ইবাদত করুক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কারণ তারা আমল করার পাশাপাশি ধর্মের মর্মবাণীকে অস্বীকার করে। অপর দিকে যারা এতিমের খোঁজখবর নেয়, তাদের উপযুক্ত প্রতিদানের ব্যাপারে হাদিসের বাণী শুনুন–

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

–আমি ও এতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে (দুই আঙুলের মতো) কাছাকাছি থাকবো।[৬৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এতিম ও নিঃস্বদের যারা যত্ন নেয়, তারা জান্নাতে আমার সাথে থাকবে- এই দুই আঙুলের মতো ন্যূনতম দূরত্ব থাকবে আমাদের মাঝে।

অপর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা বিধবা, এতিম ও দরিদ্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে, তারা সারা জীবন জিহাদে অতিবাহিত করার সাওয়াব পাবে। এটা جِهَادٌ بِالْمَالِ তথা

[৬২]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯:৩৪।
[৬৩]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা-আ ফী রাহমাতিল ইয়াতীম ওয়া..., ৭:১৫৩, হাদিস : ১৮৪১।
খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৬:২৮৩।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৭:৩৪০।

সম্পদের জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা। নিঃস্ব, এতিম ও অসহায়দের আর্থিক সাহায্য করার এতো বড়ো প্রতিদান যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান মোতাবেক সে ওই ব্যক্তির মতো, যে গোটা জীবন দিনে রোজা ও রাতে নামায পড়ে অতিবাহিত করে।

সৈয়দ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বাণী

হযরত সৈয়দ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এই নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি–

يَا عَبْدِيْ! إذَا رَءَيْتَ الْفَقِيْرَ تَقَرَّبْ إلَيَّ أنه لا حِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَه.

–হে আব্দুল কাদির! তুমি লোকদের বলে দাও "যখন কেউ অভুক্ত থাকে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট হতে থাকে, তখন তার আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে যাও। কারণ তখন আমি ও তার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না।"

হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরেকটি বাণী তার পুস্তিকায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সম্বোধন করে বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করতে চাও, তাহলে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করো; তার মাঝে তোমরা আমাকে পাবে।"

হাদিস দ্বারা উদ্ধৃত উক্তির সত্যায়ন

আল্লাহ তা'আলাকে আমন্ত্রণ করার কী অর্থ হতে পারে? একটি হাদিসে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাদিসের ভাষ্য মতে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোনো বান্দাকে বলবেন, "হে বান্দা, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা কর নি; আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাও নি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাও নি।" তখন বান্দা বলবে, "হে প্রভু, তুমি তো অসুস্থতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হতে পবিত্র; আমি কিভাবে তোমার সেবা করতে পারি? কিভাবে তোমায় আহার করাতে পারি? কিভাবে তোমায় পান করাতে পারি?" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "তোমার প্রতিবেশী অসুস্থ ছিলো; তুমি যদি তার সেবায় এগিয়ে আসতে, তবে ওখানে আমাকে পেতে। তুমি জানতে, অমুক মুসাফির ক্ষুধার্ত ছিলো; তুমি যদি তার পানাহারের ব্যবস্থা করতে, তবে তা আমার কাছে পৌঁছে যেতো- এটাই আমাকে দাওয়াত দেওয়ার অর্থ।"

অনুরূপ আরেকটি হাদিসে রয়েছে, হিসাব-নিকাশের পর এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন এক জান্নাতি ব্যক্তি তাকে দেখে প্রশ্ন করবে, "কোথায় যাচ্ছো তুমি?" উত্তরে লোকটা বলবে, "আমার আমলের কারণে আমি জাহান্নামের উপযুক্ত।" তখন জান্নাতি ব্যক্তি থেমে যাবে এবং ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবে, "আমি ততক্ষণ জান্নাতের দিকে যাবো না, যতক্ষণ এই ব্যক্তিকে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারবো না।" তখন জিজ্ঞেস করা হবে, ঘটনা কী? তখন জান্নাতি ব্যক্তি বলবে, "একদিন আমি প্রচণ্ডভাবে তৃষ্ণার্ত ছিলাম, প্রায় মুমূর্ষু ছিলাম; লোকটা আমাকে পান করিয়েছিলো। এখন তার ওই অনুগ্রহের প্রতিদানের সময় এসেছে। সুতরাং আমি এমন মানুষকে ছেড়ে জান্নাতে যেতে পারি না।" তখন আল্লাহ তা'আলা লোকটাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

কুরআন মাজিদের আরেকটা বাণী

উপরিউক্ত ধারণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআন মাজিদের আরেকটি জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۝١٢

–আপনি কি জানেন, ঘাঁটি কী? (সেটা সত্য ধর্ম)।[৬৪]

এখানেও প্রশ্নালোকে বিষয়টা বিবৃত হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে, ধর্ম ও ভালো কর্মসমূহের দুর্গম ঘাঁটি কী? প্রথমে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ধর্মের মিথ্যারোপকারী কে? আর এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে, ধর্মের উপর আমলকারী কে? পরবর্তীতের এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। ধর্মের উচ্চ ও দুর্গম স্তরে উপনীত হবার জন্য নিম্নবর্ণিত আয়াতে মানদণ্ড নিরূপিত হয়েছে।

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦

–বন্দিত্বের বাঁধন খুলে দেওয়া, অভাবের সময় আহারের ব্যবস্থা করা; নিকটস্থ এতিম এবং নিঃসম্বল দরিদ্রকে খাওয়ানো।[৬৫]

[৬৪]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১২।
[৬৫]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১৩-১৬।

অর্থাৎ বন্দিত্ব, নিপীড়ন ও দুশ্চিন্তা হতে আর্তমানবতাকে মুক্তির ব্যবস্থা করা। মানুষকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কষাঘাত হতে মুক্ত করা। বলা হয়েছে, এটাই দ্বীন। তারপর আবার ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

–তারপর সে ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে; তারা পরস্পরের মাঝে ধৈর্য ও সহানুভূতির প্রসার ঘটায়। তারাই ডানপন্থী।[৬৬]

ইসলামের এটাই সরণি; এখানে মু'মিনসম্প্রদায়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে দুঃখপ্রাপ্ত আর্তমানবতার দিকে সম্পদ নিয়ে এগিয়ে যায় এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরামর্শ দেয়। সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। মনে হচ্ছে যেন জান্নাতের দ্বারস্থ হতে এতিম, নিঃস্ব ও অসহায়দের সাহায্যের পথ মাড়িয়ে যেতে হবে।

ভালো-খারাপ উভয় পথের নির্দেশনা

কুরআন মাজিদ নিজস্ব পদ্ধতিতে উভয় পথের নির্দেশনা দেয়। এটা ধ্বংসের পথ; আর এটা মুক্তি ও সফলতার। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

–আমি তাকে উভয় পথের নির্দেশনা দিয়েছি।[৬৭]

উভয় পথের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূরা কাহফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

–যার ইচ্ছে হয়, ঈমান আনবে; আর যে চাইবে, অবাধ্য হবে।[৬৮]

এখন কেউ চাইলে ঈমানের পথ অবলম্বন করে জান্নাতে যেতে পারে; আবার কেউ চাইলে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পথ অনুসরণ করে ধ্বংস ও বিনাশের দিকে যেতে পারে। সুতরাং যারা সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্বদের কথা ভাবে না, দুর্গতদের অবস্থার উন্নয়নে কোনোরূপ উৎসাহ বা পরামর্শ দেয় না, নির্যাতিতের

[৬৬]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১৭-১৮।
[৬৭]. আল কুরআন : সূরা বালাদ, ৯০:১০।
[৬৮]. আল কুরআন : সূরা কাহাফ, ১৮:২৯।

জন্য আন্দোলনের ডাক দেয় না, তারা কুরআনের ভাষ্য মতে فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ইবাদত-নামাজের পরও ধ্বংস ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ -এর মতো বাক্য লক্ষণীয়। বলা হয়েছে, সেসব নামাজিদের জন্য আক্ষেপ ও ধ্বংস, যারা নামাজের প্রতি উদাসীন। কুরআনের কতিপয় ব্যাখ্যাকারী এটার অনুবাদ করেছেন এভাবে- তারা যত্ন ও সম্মানের সাথে নামায আদায় করে না। কিন্তু গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে উক্ত অর্থ যথার্থ মনে হয় না। কারণ যারা নামাজের প্রতি অলস, কুরআন মাজিদ তাদেরকে মুসল্লি বলতে পারে না। এখানে কুরআন মাজিদ তাদেরকে 'মুসল্লী' مُصَلِّي তথা নামাজি উপাধি দিয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে পাঁচওয়াক্ত নামাজের প্রতি উদাসীন না; তারা নামায বর্জন করে না। বরং নামায তো অবশ্য পড়ে, কিন্তু নামাজের শিক্ষা ও মর্ম হতে উদাসীন। সুতরাং عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ এর অর্থ হবে عَنْ رُوحِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ। অর্থাৎ তারা নামাজের রুহ (আত্মা) হতে উদাসীন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, নামাজের রুহ তথা আত্মা কী, যাকে উপেক্ষা করার কারণে ধ্বংস অনিবার্য? সূরাটির বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারি, সেসব লোকদেখানো নামাজি আমার বান্দাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তারা নামাজের পর নামায পড়ে যায়, কিন্তু তা নিষ্প্রাণ; শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করে থাকে।

আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি মনোযোগী থাকেন

নামাজের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, যে প্রভুর ইবাদত করা হবে, সে প্রভুর বান্দাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং যদি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে চান, তাহলে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا

–তারাই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে নম্রতার সাথে।[৬৯]

[৬৯]. আল কুরআন : সূরা ফুরক্বান, ২৫:৬৩।

উক্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

এক : তাদের হাত কারো কষ্টের কাজে ব্যবহৃত হয় না।
দুই : কেউ তাদের সাথে অসদাচরণ করলে তারা তা মার্জনা করে দেন।
তিন : আল্লাহর সান্নিধ্যে তাদের সময় নামাজে অতিবাহিত হয়।

মনে রাখা দরকার, প্রথম দুটো বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আয়াতের বিন্যাস হতে বোঝা যায়, তোমাদের এই নামায ও ইবাদত তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন তোমাদের অন্তর আল্লাহর বান্দাদের জন্য নরোম থাকবে, নিজের সম্পদের সাহায্যে তাদের কষ্ট ও দুশ্চিন্তা লাঘব করবে। যদি এরূপ করতে না পারো তবে মনে রেখো, তোমাদের নামায তোমাদের দিকেই নিক্ষিপ্ত করা হবে; এতে তোমরা কোনো প্রতিদান পাবে না। আমার বান্দাদের প্রতি উদাসীন হয়ে তোমাদের সেজদা আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

এক বিস্ময় সৃষ্টিকারী হাদিস

সহীহ বুখারী শরিফের একটি হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়ানো ছিলেন, ইকামতও হয়ে গেলো। এমন সময় মসজিদের বাইরে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কঠিন বিপদগ্রস্ত; আমাকে সাহায্য করুন।"

লক্ষ্য করুন! এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ছেড়ে মসজিদের বাইরে চলে আসেন। লোকটার সাথে কথা বলেন। তার সমস্যার কথা শোনেন। তার প্রয়োজন পূরণ করে আবার মসজিদে চলে যান এবং নামায পড়েন।

ধর্মের এই শিক্ষা আজ বিলুপ্ত প্রায়। মসজিদের মিম্বরে আজ এরূপ কোনো ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না। মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ ইসলামের এই মর্মশিক্ষাকে উচ্চকিত করা হবে না, ততক্ষণ কোনো বিপ্লব সফল হবে না। ফাঁপা ও অর্থহীন বক্তব্যে বিপ্লব সাধিত হয় না; বরং বিপ্লবের জন্য জীবনের ধারাকে পরিবর্তিত করতে হবে।

কুরআন মাজিদের সিদ্ধান্ত

আল্লাহ মানুষকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার কতো বড়ো অনুগ্রহ! তিনি সম্পদ দান করেছেন, আবার তার বান্দাদের জন্য ব্যয়

করার নির্দেশও দিয়েছেন। আবার যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের জন্য প্রতিদানের ঘোষণাও করেছেন। কতো বড়ো অনুগ্রহ! তিনি সম্পদ দান করেন, আবার সম্পদ ব্যয় করার তাওফিকও দান করেন।

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ হতে আল্লাহর প্রাপ্য বের করা এবং তার পথে ব্যয় করা কারো প্রতি অনুগ্রহ নয়; বরং এটা দ্বীন ও ঈমানের রক্ষক। اَلَّذِيْنَ يُرَاءُوْنَ (যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে)-এর আলোকে যারা কেবল বাহ্যিক বিষয়াদির প্রতি যত্নবান থাকে, আল্লাহর কাছে তাদের সেই ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। সাওয়াব ও প্রতিদান তো দূরের কথা, বরং তারা এই কারণে শাস্তির উপযুক্ত। তারপর ইরশাদ হয়েছে, وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ: কৃপণতার কারণে তারা সম্পদ আটকে রাখে।

অপরকে প্রাধান্যপ্রদান ও উৎসর্গের যে চিত্রপট কুরআন মাজিদে অঙ্কিত হয়েছে, পৃথিবীর কোনো দর্শন তার কাছেও নেই। সমাজতন্ত্র দারিদ্র্য-বিমোচনের ফুলঝুরি ছিটায়, মানুষকে সাম্যবাদের নীতিতে বিভ্রান্ত করে। অথচ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সমাজতন্ত্র শুধু উৎপাদনের উপকরণের কথা বলে; পক্ষান্তরে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। অধিকন্তু ইসলামে অপরকে প্রাধান্যদানের যে ধারণা রয়েছে, তা সমাজতন্ত্রে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। সমস্ত বস্তু, বরং গোটা মানবজীবনের সমুদয় দিক ইসলামি সমাজব্যবস্থার আওতাভুক্ত।

হযরত আবু সাইদ খুদরি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আমরা পাত্র, হাড়ি-পাতিল, রন্ধনের কাজে ব্যবহৃত উপকরণকে اَلْمَاعُوْنَ (সামান্য সম্পদ) বলতাম। কারো এটার প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে দিয়ে দিতাম।

শেষকথা- কুরআনের মাজিদের আয়াত وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-এ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হচ্ছে, তোমাদের সম্পদে দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে। এটা তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং অধিকার। এটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতো, যা উত্তরাধিকারীদের অধিকার। তাই ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ

فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

–মিরাস-বন্টনের সময় যদি কোনো আত্মীয়, এতিম বা নিঃস্ব ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহলে তাকেও কিছু দিয়ে দাও; এবং তাদের সাথে সদাচরণ করো।[৭০]

যদি অসিয়্যত না করে কোনো বিত্তবান মানুষ মারা যায়, তাহলে তার মিরাস-বন্টনের সময় এতিম ও দরিদ্রকে দেওয়া যাবে। এ পদ্ধতিতে বন্টন করলেই কুরআনের আলোকে মিরাসের বিশুদ্ধ বন্টন হবে; অন্যথায় হবে না।

[৭০]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৮।

সপ্তম অধ্যায়

উপরের পরিচ্ছেদসমূহে কুরআন মাজিদের আলোকে সম্পদের জিহাদের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরামের আচরণের উপর ভিত্তি করে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার যে, কোনো নেতার কাজে ও কথায় বিরোধ থাকলে তা মানুষের কাছে অনুকরণীয় হয় না। তিনি যা বলেন, তা যদি কাজে পরিণত করতে না পারেন, তাহলে সমাজে এটার কোনো প্রভাব থাকে না। সমাজের সদস্যদের মাঝে বিরাজমান এটা স্পষ্ট একটা ধারণা। এই মূলনীতির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়টা তুলনা করলে দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-পদ্ধতি উক্ত মূলনীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যা মুখে বলেন, তার চেয়ে ভালো করে দেখান। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি কথার তুলনায় উচ্চ ও উন্নত ছিলো। কেয়ামত পর্যন্ত আসা মানব-সভ্যতার জন্য তার জীবন-মাঝে অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে। হাদিসে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। নমুনাস্বরূপ নিচে কিছুর বর্ণনা দেওয়া হলো।

হিজরতের রাতে নিজ বাহনের ব্যবস্থাকরণ

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন এবং হযরত আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সফরসঙ্গী নির্বাচিত করেন, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি উষ্ট্রী উপস্থিত করেন, যা তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যেই লালন-পালন করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত এটাতে আরোহণ করবো না।" তখন আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব অনুনয়-বিনয় করছিলেন, "এটা আপনার জন্য হাদিয়া।" কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মূল্য পরিশোধ করার আগে ওই উষ্ট্রী-আরোহণ দুষ্কর ছিলো।

মসজিদে নববির নির্মাণে ভূমিনির্বাচন

মদিনা শরিফে পৌঁছে যখন মসজিদ নির্মাণের বিষয়টা সামনে আসে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি অনাবাদি জায়গা নির্বাচন করেন। জায়গাটা দুজন এতিমের মালিকানাধীন ছিলো। এ কথা শুনে বাচ্চা দুজন এটাকে সৌভাগ্য ভেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে আবেদন করলো, "আমরা এই জায়গাটা আপনাকে হাদিয়া হিসেবে দিচ্ছি।" রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা এখনো নাবালেগ এতিম; সুতরাং তোমরা এটা হাদিয়া দিতে পারো না। আর বিনিময় পরিশোধ না করে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।" অবশেষে মূল্য আদায়ের পর মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।

এ ধরনের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি কতো নিখুঁত ছিলো। যতক্ষণ সমাজের কর্ণধারের মাঝে তাকওয়ার ভিত্তি থাকবে না, ততক্ষণ সমাজের সদস্যদের মাঝে তার কোনো প্রভাব থাকবে না; এবং এর ফলশ্রুতিতে সমাজের প্রচেষ্টার উপযুক্ত ফলাফল পাওয়া যাবে না। এটা স্পষ্ট বিষয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্ম ও জীবন-পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-পদ্ধতির মানদণ্ডে নির্ণীত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে আমাদের কর্মকাণ্ডের কোনোই প্রভাব থাকবে না। এখন আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের কথায় ও কাজে কোনো মিল নেই; কথা ও কাজের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে পার্থিব স্বার্থ, লোভ-লোলুপতা আমাদের বেষ্টন করে রেখেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহ ও শিক্ষা হতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের কর্ম এতোটাই কপটতাপূর্ণ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীরূপে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ থাকা উচিত। আমাদের অপকর্ম ও পাপাচার এতোটাই ঘনীভূত যে, আমাদের নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা রাতের আঁধারে যা করি, দিনের আলো যদি তার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আমাদের ডুবে মরার বিকল্প নেই। আমাদের বাহিরে ও ভিতরে এতোটাই বৈপরীত্য ও দূরত্ব যে, আমাদের মুসলমানিত্ব মরীচিকার মতো দৃষ্টিভ্রমে পরিণত হয়েছে। চারিপাশে মিথ্যা-প্রতারণা-ধোঁকা আমাদের বেষ্টন করে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আলেম ইসলামের নামে স্বরচিত রুহানিয়্যাতের লেবেল লাগিয়ে কপটতার বিস্তার ঘটাচ্ছে দিগ্বিদিক। রহমতুল লিল-আলামিন রাসূল

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকতে এতোটা পাপাচারের পরও আমরা এখনো বেঁচে আছি; নয়তো আমরা টিকে থাকার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর করুণা না হলে...

পৃথিবীর জন্য আমরা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। এখনো আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ এই আয়াত–

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

–তুমি যতো দিন তাদের মাঝে থাকো, ততো দিন আমি তাদের শাস্তি দেবো না।[৭১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কারণে আমরা এখনো আল্লাহর আজাব হতে মুক্ত আছি। নয়তো আমাদের পাপাচার সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে।

ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا
আমরা বিচ্যুত হবার প্রবল চেষ্টা করেছি;
কিন্তু তোমার করুণা সঙ্গে ছিলো।

আসুন! উম্মতের উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করি

যদি আমরা নিজেদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্রের সংশোধন কামনা করি, যদি আমাদের প্রচেষ্টাসমূহের উপযুক্ত ফলাফলের প্রত্যাশা করি এবং হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাবার অপেক্ষা করি, তাহলে সেই চরিত্র ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যা প্রথম যুগের মুসলমানের কর্মপদ্ধতি ছিলো। তারা যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, সেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে। জাতি হিসেবে যদি আমরা সেসব চরিত্র গ্রহণ করতে পারি, তাহলে নির্ঘাত আমাদের পুরনো ঐতিহ্য ফিরে আসবে। তখনই সুসমঞ্জস সভ্যতার চিত্র দেখতে পাবো, যা এখন শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠাসমূহে সমাহিত হয়ে রয়ে গেছে, এবং বর্তমানে সেসব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু কল্পকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আসুন, আমরা মুসলিম উম্মাহর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে তাদের

৭১. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮:৩৩।

জীবন-চরিতের সাথে নিজেদের জীবন-চরিতের তুলনা করি, যা কুরআন মাজিদের ভাষ্য মতে সাহাবা কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে। তারা সবসময় অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصة তারা দুরবস্থার সময়েও অপরকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অপরকে খাওয়াতেন। উৎসর্গ ও অগ্রাধিকার তাদের জীবনের মর্মের সাথে জুড়ে ছিলো।

উৎসর্জনের মাপকাঠি

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামের সামনে উৎসর্গ, কুরবানি ও নিঃস্বার্থতার যে মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, তা তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এক দিকে আমরা সেই মানদণ্ডের দিকে তাকাবো; অপর দিকে নিজেদের প্রকৃত অবস্থার পর্যবেক্ষণ করবো- আত্মসমালোচনার মানসিকতা নিয়ে।

ع ببیں تفاوت رہ از کجا وتا کجاست

—এই বৈসাদৃশ্য-দূরত্ব কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত- তখন এই ধারণার জন্ম হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে আল্লাহর পথে সম্পদের ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে চিত্রিত হয়েছে—

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ،

—এক জনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট হয়; দুজনের খাবার চার জনের জন্য এবং চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট হয়।[৭২]

এই নীতি অনুসারে এক জনের খাবার দু জনের জন্য, দু জনের খাবার চার জনের জন্য এবং চার জনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট হবার ধারণাকে সামনে রাখা হলে সমাজের সদস্যগণের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি খাবারের অপচয়-রোধ সম্ভব হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো- আমাদের সমাজে এর

[৭২]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফদ্বিলাতিল মুয়াসাতি ফীত্ ত্বোয়াম..., ১০:৩৮৭, হাদিস : ৩৮২৬।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা-আ ফী ত্বোয়ামি ওয়ায়েদ..., ৬:৪৯১, হাদিস : ১৭৪৩।
গ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ত্বোয়ামিল ওয়াহেদ ইয়াকফী..., ৯:৪৬২, হাদিস : ৩২৪৫।
ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, কিতাবুল আতয়ামাহ।

উল্টো চিত্র দেখা যায়। এক জনের খাবার দু জনের মাঝে বণ্টিত হবার ঘটনা তো বিরলই; অধিকন্তু এখন দেখা যায়, এক জন দু জনের খাবার, অনুরূপভাবে দু জন চার জনের খাবার এবং চার জন আট জনের খাবার খেয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবনে হিংস্র বাঘের চরিত্র এসে পড়েছে। আমরা অপরের পকেট কাটতে কিংবা নিঃসহায়দের বঞ্চিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। দুর্বল ও বাধ্যদের আমরা শোষণ করি রাত-দিন। আমাদের আশেপাশে নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়, মানুষের বিশ্বাস ও অনুভূতির বাণিজ্য হয়, কতিপয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মানুষের অধিকার হরণ করে প্রতিনিয়ত হারাম ভক্ষণ করে যায়, অথচ আমাদের কোথাও কোনো স্পন্দন জাগে না। অগ্রাধিকার, কুরবানি ও উৎসর্গের যে মাপকাঠি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির করে গেছেন, তার বাস্তব প্রয়োগ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ইসলাম অপরকে জীবিত রাখার পদ্ধতি ও নীতির শিক্ষা দেয়; অথচ আমরা মানুষের জীবিকা হরণ করে লোভ ও কুপ্রবৃত্তির উপর জীবনের স্তম্ভ স্থির করি। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-পদ্ধতি ও কর্মনীতিকে المفرد এর আওয়াধীন অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেখানে নিম্নলিখিত ঘটনাটা পাওয়া যায়।

এক ঈদুল আজহার সময়ে খাবারের অভাব দেখা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নির্দেশ দেন, তারা যেন কুরবানির গোস্ত দু দিনের মধ্যে অসহায় ও নিঃস্বদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তৃতীয় দিন হতে হতে কারো কাছে যেন এক টুকরো গোস্তও অবশিষ্ট না থাকে। এমনটাই হলো। দু দিনের মধ্যেই তারা সব গোস্ত বণ্টন করে দেন। পরবর্তী ঈদুল আজহার সময়ও তারা অনুরূপ আমল করে। দু দিনের মধ্যেই সমস্ত গোস্ত বণ্টন করে দেন। তখন উপস্থিত সাহাবিগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي،

—আমরা যেরূপ বিগত বছর করেছি, অনুরূপ এ বছরও করেছি।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا،

–খাও, অপরকে দাও এবং জমা করে রেখে দিতে পারো।[৭৩]

পূর্ববর্তী বছর খাদ্যাভাবের কারণে বণ্টন করে দিতে বলা হয়েছিলো। পরবর্তী বছর যেহেতু খাদ্যের অভাব ছিলো না, তাই জমা করে রাখার অনুমতি দেন, যেন তা প্রয়োজনের সময় কাজে আসে।

উক্ত হাদিস হতে উদ্ভূত নীতি

এই হাদিস হতে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও কঠিনতার সময় অবশিষ্ট বস্তু মানুষের মাঝে বণ্টিত করে দেওয়াই উত্তম ইবাদত। যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাহলে অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে।

সাহাবা কেরামের এটাই অভ্যাস ও চরিত্র ছিলো, প্রয়োজনের সময় তারা অপরকে নিজের সম্পদে শরিক করতেন; অথচ আমরা মনে করি, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে পারলে সাওয়াব, আর না পারলে কোনো গোনাহ নেই। আমরা এটাকে নফল ভেবে বসে আছি। এটা আদায় করা সম্ভব হলে সাওয়াব পাওয়া যাবে; আর আদায় করতে না পরলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে খোলাফায়ে রাশেদা কিছু কিছু বিষয়কে অবশ্য করণীয় ভেবে উম্মতের জন্য অপরিহার্য করেছেন; তবে প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত হলে শিথিলতার ঘোষণা দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 'আশআরিন' নামের একটা গোত্র ছিলো। তিনি এই গোত্রের খুব প্রশংসা করতেন। এ প্রশংসা এ জন্য নয় যে, তারা খুব বেশি ইবাদত করতো এবং রাত্রি-দিন নফল নামায, তাসবিহ-তাহলিল প্রভৃতিতে মগ্ন থাকতো; বরং তাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভালোবাসার কারণ হলো, ওই গোত্রের কোনো সদস্য নিঃস্ব হয়ে পড়লে তারা সবাই নিজেদের সম্পদ একত্র করতো এবং পরস্পরের মাঝে বণ্টন করে নিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তাদের এই কর্মপদ্ধতি আমার কাছে এতোই প্রিয় যে, আমার মন চায়- তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়াতে।

[৭৩]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা ইয়াকুলু মিন লুহমিল আদ্বহা, ১৭:২৭৩, হাদিস : ৫১৪৩।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রথম পরিচ্ছেদ, বাবুল হদা।
গ) তাবরানী : সুনানুল কুবরা, ৯:২৯২।

মনে রাখা দরকার, ওই গোত্রের অধিক ইবাদত ও নফল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রিয় ছিলো না; বরং তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়ার কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রিয় ছিলো।

তারা কতো সৌভাগ্যের অধিকারী! তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত, আর তারা আমার দলে অন্তর্ভুক্ত।" এ সেই উক্তি, যা তিনি হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে করেছিলেন।

حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا،

–হুসাইন আমার অন্তর্ভুক্ত, আর আমি হুসাইনের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন।[৭৪]

অনুরূপ উক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাকার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারেও করেছিলেন। এ কারণেই হযরত সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একে অপরের সাথে সম্পদ-ব্যয়ে ও অপরকে অগ্রাধিকারদানে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন।

অভাব ও প্রাচুর্যের পার্থক্য

সাহাবা কেরামের মাঝেও কেউ কেউ আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলেন। অভাব ও প্রাচুর্যের ব্যবধান তাদের মাঝেও ছিলো। তবে যারা সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাদের মনে সম্পদের বিন্দু পরিমাণ দম্ভ ছিলো না। আর যাদের সম্পদ ছিলো না বা কম ছিলো, তাদেরও কোনো অভিযোগ ছিলো না। খাবারের টেবিলে সবাই সমান ছিলেন। প্রত্যেকের অন্তরে অভূতপূর্ব উৎসর্গ ও কুরবানির স্পৃহা ছিলো। দীনতা ও বিত্তের কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের মাঝে ছিলো না। সাম্যের বিস্ময়কর দৃশ্যপট তাদের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলো। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা, যার প্রভাবক ছাপ তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্পষ্ট ছিলো।

[৭৪]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন, ১২:২৫৪, হাদিস : ৩৭০৮।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফদ্বলিল হাসান ওয়াল হুসাইন, ১:১৬৫, হাদিস : ১৪১।
গ) তাবরিযী : আস্ সুনান, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ যিকরিল ক্বাবায়িল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এক সফরে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যাচ্ছিলাম। কয়েক জনের কাছে খাবারের উপকরণ ছিলো, অন্যদের কাছে ছিলো না। অনুরূপ কারো কাছে বাহন ছিলো, আবার কারো কাছে ছিলো না। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ كَانَ عِنْدَه فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لاظَهْرَ لَه، وَمَنْ كَانَ عِنْدَه فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لا زَادَ لَه.

–যার কাছে অতিরিক্ত বাহন আছে, সে তা অপরকে দেবে- যার কাছে কোনো বাহন নেই; আর যার কাছে অতিরিক্ত খাবার আছে, সে তা অপরকে দেবে- যার কাছে খাবারের কিছু নেই।[৭৫]

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কিছু বস্তুর নাম উল্লেখ করে তা কারো কাছে অতিরিক্ত থাকলে অপরকে দিতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি হতে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, কোনো বস্তু কারো কাছে অতিরিক্ত থাকলে তা নিজের কাছে রেখে দেওয়ার যুক্তি নেই।

হাদিসের فَلْيَعُدْ بِه-এর তাৎপর্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিতে فَلْيَعُدْ بِه বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। এখানে এক মহান দর্শন নিহিত রয়েছে। সমাজতন্ত্রে যে দর্শনের মিথ্যে ফুলঝুরি ছিটানো হয়, তা ইসলামি দর্শনের তুলনায় ন্যূনতম গুরুত্বও রাখে না। বাস্তবতা এই যে, ইসলামের মতো বৈপ্লবিক কোনো ধর্ম পৃথিবীর বুকে কখনো ছিলো না, কখনো আসবেও না। আজ পর্যন্ত কোনো দার্শনিক, চিন্তাবিদ বা বিশেষজ্ঞ ইসলামের চেয়ে উন্নত জীবন-ব্যবস্থার ধারণা দিতে পারে নি; আর তা সম্ভবও না। দুনিয়া-আখিরাতের সরদার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فَلْيَعُدْ بِه বাক্যাংশ দ্বারা এটা স্পষ্ট করেছেন যে, যে সমাজে কিছু সদস্যের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, আর কারো কাছে কিছুই থাকে না, তা হলে যাদের কাছে অতিরিক্ত থাকে, তারা তাদের

৭৫. ক) আবূ দাউদ : আস্ সুনান, ফী হুকুক্বিল মাল, ৪:৪৭৩, হাদিস : ১৪১৬।
খ) বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, বাবু মান কানা ইনদাহু ফদ্বলি যহ্রিহি, ৭:৩৫১, হাদিস : ৩২৩৬।
গ) আবু আওয়ানা : আল মুসতাখরাজ, বাবুল খবরিল মাওজিব..., ১৩:৬২।

অবশিষ্টাংশ বঞ্চিতদের মাঝে বন্টন করে দেবে। কারণ এটা তাদের প্রাপ্য। ইসলাম প্রাপকদের কাছে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কি এই অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না? আমরা যখন আমাদের প্রতিবেশী পরিবেশের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই- সমাজের সদস্যদের মাঝে সম্পদের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের অনতিক্রম্য ব্যবধান বিদ্যমান। এক দিকে কিছু লোক এক বেলা আহারের অভাবে মারা পড়ছে; অপর দিকে আরেক দল সম্পদের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। যারা হালাল জীবিকার সন্ধান করে, তারা ক্রমে ক্রমে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে; অপর দিকে কিছু লোক নির্বিশেষে সুদ-ঘুষ প্রভৃতিতে প্রমত্ত জীবন যাপন করছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, হালাল পদ্ধতিতে উপার্জনকারীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য; অপর দিকে অগুনতি মানুষ সুদ-ঘুষ আর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রক্তশোষণে ব্যতিব্যস্ত। সিপাহি আর পুলিসদের কথা কী বা বলবো। তাদের অল্প পারিশ্রমিকে কঠোর পরিশ্রমের ঝুঁকি নিতে হয় পদে পদে। তাদের জীবিকার বিষয়টা অত্যন্ত প্রকট ও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিধানের কাপড় যোগাড় করা দুষ্কর হয়, অসুস্থতার সময় চিকিৎসার সুযোগ থাকে না।

মোটকথা, অধিকাংশ মানুষ অবর্ণনীয় বিপদ ও অনির্বচনীয় দুর্দশায় দুর্কবলিত। তাদের পরিশ্রমকে পুঁজি করে কিছু মানুষ বিলাসিতায় মগ্ন। তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে; আর যারা নিঃস্ব তাদের সন্তানদের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের দুয়ার রুদ্ধ থাকে। এতে কেউ প্রশ্ন করারও কেউ নেই।

আক্ষেপের বিষয়! আমরা হালাল-হারামের উপদেশ দেই; অথচ নিজেদের জীবনের ভিত্তি হারামের উপর। হারামের সময়ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমরা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করি না। সুদ-ঘুষ-বেইমানি-প্রতারণা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। ঘুষের ব্যাপারে বড়ো বড়ো কথা বলি। সুদের কারণে নিম্নশ্রেণির কর্মচারী কনস্টেবল, সিপাহি প্রমুখকে গ্রেফতার হতে দেখা যায়, কিন্তু যারা সুদের আখড়ায় বসে আছে, সেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কখনো গ্রেফতারের আওতায় আসে না। এটা নিঃসীম ও চূড়ান্ত অত্যাচার। এটা কি কখনো ভেবে দেখেছি? সরকারের উচ্চপদস্থরা সুদ-ঘুষের প্রসার ঘটায়, আর তার পরিণতি আচড়ে পড়ে সাধারণ নিম্নস্তরের কর্মচারীদের উপর। অধার্মিকতা ও ঘুষের উৎস হচ্ছে সরকারি দফতর। যতক্ষণ পর্যন্ত ফারুকে আজমের সোনালি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং অপরাধীদের জনসম্মুখে শাস্তি দেওয়া হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পাপাচারের সমাপ্তি ঘটবে না।

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসনামলে হযরত আমর বিন আল-আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিসরের গভর্নর ছিলেন। হজ্জের সময়কালে এক দিন তিনি সবার সামনে ঘোষণা করলেন, কারো কোনো অভিযোগ থাকলে পেশ করতে পারো। হঠাৎ এক ব্যক্তি উঠে হযরত আমর বিন আল-আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে জনসম্মুখে একশোটা বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হলো। তখন কিছু চিন্তাবিদ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আপনি যদি এভাবে গভর্নরদের শাস্তি দেন তাহলে হয়তো এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যাতে পুরো শাসনব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি কি তোমাদের এসব রাষ্ট্রীয় দর্শনের দিকে তাকাবো নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন দেখো, বদলা নেওয়ার জন্য তিনি নিজের পৃষ্ঠের চাদর খুলে দেন। এ পরিস্থিতি দেখে অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়।

শেষকথা

উপরে বিস্তৃত আলোচনায় বিবৃত ধারণার সারমর্ম হলো- মুসলমানের গোটা জীবন জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা অবিরাম প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের আওতা হতে মুক্ত। মনে রাখতে হবে, যখন কেউ হারাম লোকমা ভক্ষণ করে, প্রথমে সে অনিচ্ছায় নিরুপায় হয়ে করে; কিন্তু যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন হারামের নির্যাস তার শিরায়-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়। তখন সে শয়তানের অনুসরণ করতে করতে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। এখান থেকেই আমাদেরকে জিহাদের সূচনা করতে হবে। যখন সমাজের কোনো সদস্য হালাল-হারামের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না, প্রথমে সে যদিও অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, কিন্তু পরে সে অত্যাচারীরূপে আবির্ভূত হয়। তার আচরণ তখন মানুষকে ঘুমোতে দেয় না। সর্বাবস্থায়, সর্বমহলে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জিহাদ করতে হবে। জিহাদের এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় ও অত্যাচার মূলোৎপাটিত না হয়। দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, পরমুখাপেক্ষিতা, বঞ্চনা ও বেকারত্ব আমাদের সমাজে কলঙ্কের দাগ এঁকেছে। ইসলামি বিপ্লবের দাবি হলো- মানুষের বিপদ, দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা দূরীকরণে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার সমূলে বিনাশ ঘটানো।

সমাপ্ত